কেরানী

নিমাই ভট্টাচার্য

পরিবেশক : বিশ্বজ্ঞান
৯/৩ টেমার লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯

পরম স্নেহাস্পদ

শ্রীমান হিমাংশু শেখর ভট্টাচার্য কে

কেরানী

নমস্কার! আমার নাম সোমনাথ সরকার। আগে কদাচিৎ কখনও শ্রী জুড়লেও শেষে কিছু লেখার নেই। ছোটবেলায় বড় বড় লোকের বাড়ির দরজায় নেমপ্লেট পড়তে পড়তে ভাবতাম একদিন আমারও বাড়ির দরজায় নেমপ্লেট লাগাব কিন্তু তা আর হল না। হবেও না। ঝুলিতে যার শুধু স্কুলের হেডমাস্টার মশায়ের সার্টিফিকেট সে কী বাড়ির দরজায় নেমপ্লেট লাগাতে পারে? ইন্দুদার মত যদি কালকাজীর বাঙালী কলোনীতে বাড়ি বানাতে পারতাম তাহলেও হয়ত নেমপ্লেটে লিখতাম এস সরকার। তাও হবার নয়।

আপনারা আমাকে চিনবেন না। শুধু নাম শুনেই যাদের আপনারা চিনতে পারেন, আমি তাদের দলের নই। আমি রাজা-উজীর মন্ত্রী এম. পি—এম. এল. এ. না। আমি আই-সি-এস না। তাছাড়া আমাদের কালে ইচ্ছা বা কেরামতী থাকলেও আই-সি-এস হওয়া যায় না। আমি আই-এ-এস নই। আমি ক্রিকেটের টেস্ট প্লেয়ার না। আমি বেদী-চন্দ্রশেখর বা পতৌদী-বিশ্বনাথকে জীবনে কোনদিন দেখি নি। আমি অলিম্পিকে যাই নি। আমি সিনেমায় নামি নি, থিয়েটার করি নি। এমন কি রেডিও অফিসে খাঁটি ঘানি মার্কা বিশুদ্ধ সরিষার তৈলের সদ্ব্যবহার করে পঁচিশ টাকার আর্টিস্টও হতে পারি নি। আমি কিছুই না। ব্ল্যাক মার্কেটিং, চুরি-জোচ্চুরি, খুন-ডাকাতি বা অবলা নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করে খবরের কাগজে নাম ছাপাবার মুরোদও আমার নেই। আমি ভারত সরকারের একজন কেরানী। কলকাতার ডালহৌসী পাড়ার সংগ্রামী মানুষদের পোস্টারের ভাষায় করণিক। সাহেব-সুবা অফিসারদের ভাষায় ক্লার্ক। ইংরেজী সওদাগরী

অফিসে বলে অফিস স্টাফ। বেনিয়াদের দপ্তরে বলে বাবু। আমাদের দেশের ভদ্র-শিক্ষিত মানুষের চোদ্দ আনাই কেরানী, তবু কেরানী বলে পরিচয় দিতে আমাদের বড় দ্বিধা, সঙ্কোচ। সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের দেশের মানুষ হয়েও এটুকু সত্যি কথা বলার মত সাহস বা শিক্ষা আমাদের নেই। জাপান-জার্মানীর কথা জানি না, রাশিয়া-আমেরিকার কথাও বলতে পারব না কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকরাই যে বেশী মিথ্যে কথা বলে তা প্রতিদিন শুনছি জানছি। বোধহয় কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে কয়েক বছর যাতায়াত করলে আমিও স্বীকার করতে পারতাম না আমি কেরানী।

স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিগুলো কেরানী তৈরী করতে না পারলে কবে গণেশ উল্টাত! কেরানী না থাকলে স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কলকারখানা, হাসপাতাল পোস্টাফিস—সব বন্ধ হয়ে যেত। কেরানী না হলে দোকান-বাজার-ব্যাঙ্কও চলত না। থানা-পুলিশ আছে বলে দেশ চলছে না—দেশ চলছে লক্ষ লক্ষ কেরানীদের জন্য। আমরা না থাকলে কে বা কারা তামিল করত প্রধানমন্ত্রীর হুকুম? তবু কেরানী শুনলেই আমরা নাক সিঁটকে উঠি, খবরের কাগজের পাত্র-পাত্রী কলমে কেউ কেরানী পাত্র চান না। কেরানীও কেরানী বলে পাত্রীর সন্ধান প্রার্থনা করেন না। প্রজাপতির শেয়ার মার্কেটে একটু ভাল দাম পাবার জন্য ভূপেন মিত্তির বিজ্ঞাপনে লিখেছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ী চাকুরে। মূর্খ! প্রেসিডেণ্ট, প্রাইম মিনিস্টার আর কয়েক ডজন মিনিস্টার ছাড়া সবাই তো কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ী চাকুরে। পাত্র ভূপেন মিত্তির কেরানী নাকি আই-সি-এস ক্যাবিনেট সেক্রেটারী?

কেরানীকে সবাই ঘেন্না করেন। এমনকি কেরানীও কেরানীদের দেখতে পারে না। ফরাসী বিপ্লব, অক্টোবর বিপ্লবের পর দুনিয়ার মজদুর এক হচ্ছে, এক হচ্ছে ক্ষেত-খামারের চাষী। আমাদের দেশেও শুধু কলকারখানার মজদুর নয়, রাজা-উজীর ও কোটিপতিরাও এক হচ্ছে। কিন্তু কেরানীদের এক করার মত মহাবিপ্লবী বোধহয় আজও জন্মগ্রহণ করেন নি। কলকাতার কাগজে পড়ি কেরানীরা

কখনও কখনও দল বেঁধে ঝাণ্ডা নিয়ে ময়দান যাচ্ছেন, হাতে হাত মিলিয়ে নিজেদের দাবী আদায় করছেন বুর্জোয়া-আমলাতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। দিল্লীতে কেরানীকুলের কাছে এমন কোরাস গান শোনা সুদূর পরাহত। কেরানী হয়ে কেরানীদের ঘেন্না করাই এখানে চিত্ত বিনোদনের প্রথম ও প্রধান উপকরণ।

হ্যারে, বটকেষ্ট বলে মিনিস্টারের পার্সোন্যাল সেল'এ যাচ্ছে ?

যাচ্ছে মানে ? অলরেডি জয়েন করেছে।

অলরেডি জয়েন করেছে ?

এ খবর তো সবাই জানে অথচ তুই জানিস না ?

জানলে কি তোকে জিজ্ঞাসা করতাম ? কত স্পেশ্যাল পে পাচ্ছে জানিস ?

কত ?

পঁচাত্তর।

বলিস কিরে ?

এ ছাড়া মাসে মাসে কত ওভার-টাইম হবে জানিস ?

নিশ্চয়ই একশ' দেড়শ'...

ওখানে অর্ডালী-বেয়ারারাও ওর বেশী ওভার-টাইম পায়। বটকেষ্ট এ্যাটলিস্ট তিনশ'-সাড়ে তিনশ' পাবে।

কিন্তু অত টাকার ওভার-টাইম তো করতে পারে না।

ওরে শালা, মিনিস্টারের পার্সোন্যাল সেল'এ সবকিছু হয়।

আচ্ছা তুই বল, ওর মত একটা হোপ্লেস ছেলে ওখানে কি কাজ করবে ? আর কেউ না জানুক আমি তো জানি ওর দৌড় কদ্দূর।

কি আর করবে ? তৈল মর্দন আর দালালী করবে।

এই ছুটো কোয়ালিফিকেশন নেই বলে আমরা কিচ্ছু পারলাম না।

নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যেই ওরা দুজনেই বটকেষ্টর কাছে প্রায় গলিতং।

হ্যালো! মিঃ ঘোষ দেয়ার ?

স্পীকিং।

বটকেষ্ট! আমি ত্রিদিবদা বল্‌ছি।

কেমন আছেন দাদা?

দিনে আণ্ডার সেক্রেটারী আর সকাল-সন্ধ্যায় বউ-ছেলেমেয়ের সেবা করছি।

তা যা বলেছেন! সবারই এক হাল!

এবার তোমার বৌদির কথাটা বলি।....

কি হলো বৌদির?

কিছু হয় নি। কলকাতা থেকে ছোট শালা নলেন গুড় এনেছে। তোমার বৌদি বলছিলেন নলেন গুড়ের···

পায়েস তো?

হ্যাঁ হ্যাঁ।···

খবর দেবেন। ঠিক সময় পৌঁছে যাবো।

প্রায় সবারই এই এক রোগ। দিনুদার সঙ্গে দেখা হলেই জিজ্ঞাসা করবেন, কিগো সোমনাথ, কেমন আছো?

মোটামুটি ভালই আছি।

'আচ্ছা কুমুদের কিছু খবর জান?

আমার সঙ্গে বহুদিন দেখা হয় না। কে যেন বলছিলেন কুমুদদা মাস দেড়েকের ছুটি নিয়েছেন। হয়ত কলকাতা গিয়েছেন।

দিনুদা হেসে বললেন, ও শালা কি এখন কলকাতা যেতে পারে?

কেন? শরীর-টরীর···

ঐ দানবের শরীরে আবার কি হবে।

কুণ্ডুবাবুর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া আদর-যত্ন একটু বেশী পাচ্ছে বলে হতচ্ছাড়া বউকে ছ'মাস ধরে বাপের বাড়ি থেকে আনছে না।

বাস আসতেই আমি বললাম, দিনুদা, চললাম। কিন্তু দিনুদাকে ছেড়ে বাসে উঠলেই কি এসব কাহিনী শোনার পালা শেষ হয়।

সোমনাথ, এগিয়ে আয়।

সমীর ঘোষের ডাকে এগিয়ে গেলাম। ওর কাছে যেতেই জিজ্ঞাসা করলাম, কিরে নতুন বর, কেমন আছিস?

বাড়ি পাচ্ছি না বলে বউকেই আনতে পারছি না।...

সেকি?

সত্যি বলছি। তাছাড়া আর মেসের খাবার সহ্য হচ্ছে না।

তুই যে কি করে এত বছর ধরে মেসের খাবার খেয়ে আছিস, তা তো আমি ভাবতেই পারি না।

তোর মত ভাগ্যবান হলে আমিও ভাবতে পারতাম না।

আরো কিছুক্ষণ ধরে একথা-সেকথার পর সমীব এদিক-ওদিক চেয়ে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে একটু চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল হ্যারে, কুমুদবাবু কেমন রে?

হঠাৎ ওর কথা জিজ্ঞেস করছিস যে?

কুমুদবাবু একটা ঘর সাব-লেট করবেন শুনে আমি ওর কাছে গিয়ে প্রায় সবকিছু পাকা করে ফেলেও পিছিয়ে গেলাম।

কেন?

শুনলাম কুমুদবাবু লোকটা সুবিধের না।

তার মানে?

শুনছিলাম ওর চরিত্র ভাল না। কোন এক কুণ্ডুবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে....

কিছু কিছু লোক বলাবলি করেন জানি কিন্তু এসব ব্যাপার বাইরের লোকের পক্ষে কতটা জানা সম্ভব তা তুই নিজেই বিচার কর।

তা ঠিক কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে....

একটু কান পেতে থাকলে কেরানীদের সব আড্ডাতেই এই ধরনের কোন আলোচনা শোনা যাবে। কেরানী হয়েও যে নিজেকে কেরানী বলে পরিচয় দেবার মত সাহস, চরিত্র বল দেখাতে পারে না....।

যাক গে ওসব। আমি গঙ্গার সঙ্গে প্রথম দিন আলাপ করার সময়ই জানিয়েছিলাম আমি ভারত সরকারের কেরানী। ও হাসতে হাসতে বলেছিল, আমিও কেরানীর মেয়ে। জন্ম থেকে কেরানী পাড়াতেই বাস করছি। সুতরাং....

পরে একদিন ব্রিজের ধারে বেড়াতে বেড়াতে বলেছিল, তুমি যে

মুক্তকণ্ঠে নিজেকে কেরানী বলতে পেরেছিলে সেজন্যই তোমাকে ভাল লেগেছিল।

একটু লেখাপড়া শিখলেই মেয়েরা আর কেরানী স্বামী চায় না। স্বপ্ন দেখে ডাক্তার-এঞ্জিনিয়ার—আই-এ-এস বা আই এফ এস স্বামীর। গঙ্গা কলেজে পড়লেও চেয়েছে কেরানী স্বামী, আশা করেছে লোদী কলোনীতে থাকবে। অনেক কেরানীর বউ দেখলাম কিন্তু আমার গঙ্গার মত বউ কেউ পায় নি। খাঁটি ঘানি ভাঙা সরষের তেলের মত একটু বেশী ঝাঁজ থাকলেও গঙ্গার যেমন রূপ তেমন গুণ। আমি ঠাট্টা করে বলি গঙ্গা, তুমি মাঝে মাঝে ব্রহ্মপুত্রের মত গর্জে না উঠলে বোধহয় লেনিন শান্তি পুরস্কার পেতে।

গঙ্গা হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে, আর কোন পুরস্কার পাব না?

আমিও হাসতে হাসতেই বললাম, ইচ্ছা করলে বা একটু চেষ্টা করলেই তুমি আরো অনেক প্রাইজ পেতে পারো।

যেমন?

সুইমিং ট্রাঙ্ক পরে ওবেরয় হোটেলের ব্যাংকোয়েট হলে ক্ষুধার্ত কিছু মানুষের সামনে দাঁড়াতে পারলেই বিউটি কনটেস্টে....

মনে মনে খুশী হলেও গম্ভীর হয়ে বললো, তুমি আমাকে কি ভাব বল তো? আমি যদি বিউটি কনটেস্টে....

দেখো গঙ্গা, আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি খাটাউ ভয়েল বা টাঙ্গাইল শাড়ীর আড়ালে তোমার কি ঐশ্বর্য...

গঙ্গা সঙ্গে সঙ্গে আমার চুলের মুঠি ধরে এক ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, তুমি এত অসভ্য জানলে আমি তোমাকে বিয়েই করতাম না।

যদি বলি আমি অসভ্য বলেই তুমি আমাকে বিয়ে করেছ।

তা তো বটেই! এখন ফাঁসিতে ঝুলে পড়েছি বলে যা ইচ্ছে বলে যাও।

গঙ্গা সত্যিই সুন্দরী। জবাকুসুম বা বোম্বে ডাইং'এর বিজ্ঞাপনের মত ও যখন আমার পাশে আলু-থালু হয়ে শুয়ে থাকে তখন ওকে যে কি দারুণ দেখতে লাগে তা শুধু আমিই জানি। মাঝে মাঝে ও ঘুম

থেকে উঠলেই আমি গম্ভীর হয়ে বলি, গঙ্গা, বুকের মধ্যে কেমন একটা যন্ত্রণা হচ্ছে।

ও তাড়াতাড়ি উঠে বসেই আমার বুকের উপর হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যন্ত্রণা করছে।

সারা বুক জুড়ে।

সারা বুকে?

হ্যাঁ।

হঠাৎ?

তুমি এমন মারাত্মকভাবে শুয়ে থাকো যে তা দেখলেই...

গঙ্গা সঙ্গে সঙ্গে দূরে সরে যায়। বলে, এই সাত সকালেই তোমার অসভ্যতা শুরু হলো!

যাকগে ওসব। গঙ্গার কথা পরে হবে। শুরুতেই বউয়ের প্রশংসা বা নিন্দা করা ঠিক নয়। আপনারা সবাই কেরানীদের ঘেন্না করেন, কৃপা-দৃষ্টিতে দেখেন। ভাবছেন কেরানী সোমনাথ সরকার আবার বক বক শুরু করল কেন। ভাবছেন ভারত সরকারের একজন কেরানী আবার নতুন কি বলবে। স্যার, একটু ধৈর্য ধরুন। কেরানী হলেই কি তার ঝুলি শূন্য হবে? সে কি সমাজ-সংসারের কেউ না? আমাদের কি চোখ-কান নেই? আমরা কি কিছু কম জানি, না শুনি? উদ্যোগ ভবনের কমার্স মিনিস্ট্রির কেরানী হলেও অনেক মিনিস্ট্রির বহু গোপন খবর আমরা পাই, জানতে পারি অনেক কাপুরুষ-মহাপুরুষের কাহিনী। জানি না আমার মত কেরানীর এই প্রলাপ ভাল লাগবে কিনা, তবে কেরানীর কাহিনী নিয়ে সিনেমা দেখতে প্রায় সবারই উৎসাহ দেখি।

ইন্দুদা বলেন, বুঝলি সোমনাথ, আমরা কেরানীরা হচ্ছি হলুদের গুঁড়ো। সব রান্নাতেই দরকার কিন্তু কেউ পরোয়া করে না।

শিবনাথদা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আমার বউও ঠিক ঐ কথা বলে।

কি বলে?

বলে, না চাইতেই তোমার সব প্রয়োজন, দাবী মেটাচ্ছি বলে ঠিক দাম দাও না কিন্তু যখন না থাকব, তখন ঠেলাটা বুঝবে।

কেষ্ট ঘোষ চারমিনারে টান দিয়েই বললো, সব বউগুলোই কি একই গানের স্কুলের ছাত্রী ?

কেশব দত্ত জিজ্ঞাসা করল, তার মানে ?

কেষ্ট ঘোষ রেগে বললো, তুই শালা বছর বছর বউটাকে মেটারনিটি ওয়ার্ডে পাঠিয়ে বুদ্ধির বারোটা বাজিয়েছিস। বলছিলাম সব বউই কি স্বামীদের একই গান শোনায় ?

কেশব দত্তর বুদ্ধি-সুদ্ধি একটু কম হলেও মাঝে মাঝে দু'টো-একটা বড় মজার কথা বলে। খুব গম্ভীর হয়ে কেশব দত্ত বললো, আসল কথা কি জানিস কেষ্ট ঘরকা মুরগী ডাল বরাবর। বউ যত ভাল, যত সুন্দরীই হোক, তাতে কি মন ভরে ?

কেশব দত্তর কথায় আমরা হাসিতে ফেটে পড়লাম।

কেশব দত্ত একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে বললো, তোদের অভিজ্ঞতা নেই বলে তোরা হাসছিস। বাড়ির মুরগী যে ডালের সমান তার প্রমাণ চাস ?

কেশব দত্তকে একটু রাগিয়ে দিলে অনেক রসের কথা জানা যায়। আমি তাই বললাম, দিতে পারবি তো ?

লাঞ্চ আওয়ারের আড্ডা। কেশব দত্ত একবার হাতের ঘড়িটা দেখে নিয়ে বললো, আমাদের অফিস স্পোর্টস-এর সময় আমাদের মিনিস্টারের ওয়াইফকে দেখেছিলি ?

আমি বললাম, অতক্ষণ ধরে কাপ-মেডেল বিতরণ করলে না দেখে উপায় আছে ?

বল কেমন দেখতে ?

কেষ্ট ঘোষ চারমিনারে শেষ টান দিয়ে বললো, দেখতে তো হেমা মালিনী !

আমরা হাসলাম।

কেশব দত্ত হাসল না। গম্ভীর হয়ে বললো, ভদ্রমহিলা নাগপুর

ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করার পর গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়াদের একটা কলেজে প্রফেসারী করতেন। আমাদের অনারেবল মিনিস্টার সাহেব তখন ঐ গোয়ালিয়রেই ল প্রাকটিশ করতেন। ল প্রাকটিশ একটু জমতে না জমতেই শর্মাজী জনসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন এবং আস্তে আস্তে অধ্যাপিকা মিনতি মিশ্রের সঙ্গে ওর আলাপ হলো।

কেষ্ট ঘোষ চার-পাঁচ টানেই একটা চারমিনার শেষ করে। এক নম্বরের কুঁড়ে কিন্তু কাজ ধরলে ওর মত চটপট কেউ করতে পারবে না। অল্পতেই ওর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। কেশব দত্ত-র দীর্ঘ বৃত্তান্ত শোনায় ওর আগ্রহ নেই। তাই বললো, ছাখ দত্ত, সারা রাত্তির জেগে কর্ণার্জুন অভিনয় দেখার যুগ এটা নয়। এটা সত্যজিৎ রায়ের যুগ। দেড় ঘণ্টায় সব শেষ।

দু-পাঁচ বছরের ছোট-বড় হলেও উদ্যোগ ভবনে অনেক কাল একসঙ্গে কাটিয়ে আমাদের সম্পর্ক বাইরের লোকজনের পক্ষে বুঝা কঠিন। কেশব দত্ত বিশেষ বুদ্ধিমান না হলেও তেতে উঠলে বেশ রং খুলে যায়। কেষ্ট ঘোষ থামতেই ও বললো, আগে ভাবতাম গান্ধীজী পরলোক যাত্রা করলে ভারতবর্ষও ইহলোকে থাকবে না। কিন্তু ইন ফ্যাকট রাজঘাটে গান্ধীজী বিলীন হয়ে যাবার পরই ইণ্ডিয়ার ফেমাস ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের জন্ম ও জয়যাত্রা শুরু।....

তুই কী কোন কিছুই ছোট ক'রে বলতে পারিস না · আবার একটা চারমিনার ধরাতে ধরাতে কেষ্ট মন্তব্য করল।

বলছিলাম তুই আরো দশ-পনের মিনিট পরে অফিসে ঢুকলে উদ্যোগ ভবনের চূড়ো ভেঙে পড়বে না।

টীকা-টিপ্পনী চলতে চলতেই কেশব দত্তর কাছে শুনলাম অধ্যাপিকা মিনতি মিশ্রের মত রূপবতী, গুণবতী মেয়েকে বিয়ে করেও শর্মাজীর মন ভরেনি। ভারত সরকারের ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের একজন ডেপুটি ডিরেক্টর.......

আমরা তিন-চারজন একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম, কি নাম? কি নাম?

মিস শিউলি ঘোষ।

বাঙালী!—আবার সবাই একসঙ্গে বললাম।

কেশব দত্ত পার্লামেণ্ট সেল-এ কাজ করে। যখন তখন মন্ত্রীর অফিসে-বাড়িতে যেতে হয়। পার্লামেণ্ট সেসনের সময় অন্তত দু-চারদিন মাঝ রাত্তির পর্যন্ত মিনিস্টারের বাংলোতে কাটাতে হয়। অনেক সময় অনেক গোপন কাজও করতে হয়। তাইতো ওর ভাড়ে অনেক রসদ, অনেক খবর।

মিস ঘোষ তখন দিল্লীতে পোস্টেড। দশ-পনের দিন পর পর মন্ত্রীর অফিসে এসে দেখা করতেন। মন্ত্রীর ঘরের বাইরে লাল-আলো জ্বলতো আধ ঘণ্টা-পয়তাল্লিশ মিনিট। বেয়ারা-চাপরাশীরা চাপা গলায় একটু রসের আলোচনা করলেও শর্মাজীর মনে যে শরৎ-শিউলির গন্ধে, মাদকতায় বসন্তের দোলা লেগেছে, তা কেউ জানতেন না। জয়পুর থেকে ঘুরে আসার পর পরই ফার্স্ট পার্সোন্যাল এ্যাসিসট্যাণ্ট সুদকে অপ্রত্যাশিতভাবে স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের নিউইয়র্ক অফিসে পাঠিয়ে দেওয়াতে উদ্যোগ ভবনের অন্দর-মহলে গুঞ্জন শুরু হলো, শুরু হলো রহস্য উদ্ধারের অভিযান। যত বড় ধুরন্ধর রাজনীতিবিদই মন্ত্রী হন না কেন, উদ্যোগ ভবনের হাঙ্গর-কুমীরের কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে রাখা অসম্ভব। একটু সময় লাগলেও কিছুই অজানা রইল না।

শিউলি ঘোষ একদিন আগেই জয়পুর পৌঁছেছিলেন। শর্মাজীর অভিপ্রায় অনুযায়ী উঠেছিলেন খাসা কোঠীতেই। পরের দিন শর্মাজী এসেও সরকারী অতিথিশালা-হোটেল খাসা কোঠীতেই উঠলেন। তারপর রাজস্থান চেম্বার অফ কমার্সের বার্ষিক সাধারণ সভায় ভাষণ দিয়ে আসার সময়ই ফার্স্ট পি এ সুদকে বললেন আমার ভীষণ মাথা ধরেছে। আই উইল টেক রেস্ট আফটার লাঞ্চ। কেউ যেন আমাকে বিরক্ত করে না বলে দিও।

স্যার, আফটারনুনে আপনার সঙ্গে কয়েকজনের দেখা করার কথা আছে যে....

টেল দেম টু সী মী টুমরো মর্নিং। আর তুমি সাড়ে পাঁচটার সময় টেলিফোন করে আমাকে জাগিয়ে দিও। মন্ত্রী আপন মনেই বিড় বিড় করলেন, এইসব ফালতু রিসেপসন-টিসেপসন আর ভাল লাগে না।

সাড়ে পাঁচটায় টেলিফোন করে দু-পাঁচ মিনিট পরে মন্ত্রীর ঘরের সামনে সুদ পৌঁছতেই সিকিউরিটি গার্ড একটু মুচকি হাসল। সুদ জিজ্ঞাসা করল, হাসছ কেন?

এমনি।

এমনি কি কেউ হাসে। বল না কী ব্যাপার।

আরো দু-চারবার অনুরোধ উপরোধের পর সিকিউরিটি গার্ড জানাল, সারা দুপুরই সাহেবের ঘরে একজন মহিলাও আছেন। সুদ আগ্রহের আতিশয্যে যথারীতি দরজায় টোকা মেরেই ঘরে ঢুকে আবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল। সুদকে আর এদেশে রাখা নিরাপদ মনে করলেন না শর্মাজী। তাছাড়া সুদকে খুশী করারও প্রয়োজন অনুভব করলেন।

টোকিও বিশ্বমেলায় শিউলি ঘোষকে স্পেশ্যাল অফিসার করে পাঠান নিয়ে যখন পার্লামেণ্টে প্রশ্ন উঠেছিল তখন ভেবেছিলাম শর্মাজীর বাঙালী প্রীতি ওদের অসহ্য। কেশব দত্ত-র কাছে সব শোনার পর বুঝলাম বিরোধী পক্ষের এম পি-রা এমনি এমনি চেঁচামিচি করে নি।

শিউলি ঘোষকে আমি চিনি না, জানি না কিন্তু তবু মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম। উদ্যোগ ভবনের গর্ব আমরা চা রপ্তানী করি সারা পৃথিবীতে কিন্তু একথা হলপ করে বলতে পারি উদ্যোগ ভবন ক্যান্টিনের চা খাবার পর ভারতীয় চায়ের সুখ্যাতি করা অসম্ভব। মাসের সাতাশ তারিখে শুধু ঐ চা খেয়েই আমাদের লাঞ্চ পর্ব সমাধা হলেও শিউলি ঘোষের কৃপায় বেশ হাসতে হাসতেই যে যার ব্রাঞ্চে চলে গেলাম।

এখন উদ্যোগ ভবনের রস ও রসদের সন্ধান পেয়েছি কিন্তু সান্যাল মেশোমশাইয়ের কৃপায় যেদিন কেরানীগিরি করতে উদ্যোগ ভবনে ঢুকেছিলাম সেদিন সত্যি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তার অবশ্য অনেক কারণ ছিল। বাবা রিটায়ার করার আগেই দাদাকে সি পি ডবলিউ ডি-তে ঢুকিয়েছিলেন। বাবা নিজে সারা জীবন সি পি ডবলিউ ডি-তে কাটিয়ে জানতেন এর চাইতে নিরাপদ রসের আড্ডা ভারত সরকারের অধীনে পাওয়া মুস্কিল। আমার বাবার নাম রঘুনাথ সরকার কিন্তু সি পি ডবলিউ ডি-র বাঙালী কর্মচারী মহলে উনি রাঘব বোয়াল নামে খ্যাত ছিলেন। যারা আমার বাবাকে চিনতেন এবং আমাকেও চেনেন তাদের অনেকে এখনও আমাকে রঘুনন্দন বলে ঠাট্টা করেন।

আমার ঠাকুর্দা ঈশ্বরদাস সরকার বনেদী কেরানী ছিলেন। অর্থাৎ ইংরেজ আমলে ভারত সরকারের ল ডিপার্টমেন্টের কেরানী ছিলেন। দিনে পুরো দস্তুর সাহেব সেজে ইংরেজের সেবা করলেও সন্ধ্যার পর নিছক বাঙালীবাবু হয়ে হরিসভায় কীর্তন গাইতে যেতেন। আমার স্বনামধন্য পিতৃদেব রাইসিনা স্কুলের ছাত্র থাকার সময়ই প্রমথেশ বড়ুয়া সাহেবের ভক্ত হয়ে ওঠেন। বড়ুয়া সাহেবের অনুকরণে জামা-কাপড় পরা থেকে শুরু করে তাঁর হাঁটাচলা কথাবার্তা পর্যন্ত বাবা অনুকরণ করতেন। গোল মার্কেট পাড়ায় বাবার নামই ছিল ছোট বড়ুয়া। তিনবার লাট খাবার পর চতুর্থ বারে যখন সত্যি সত্যিই বাবা রাইসিনা স্কুল থেকে বিদায় নিলেন তখন দাদু আর দেরী করলেন না। রায় বাহাদুর দেবীপ্রসন্ন চক্রবর্তীকে ধরে বাবাকে সি পি ডবলিউ ডি-তে ঢুকিয়ে দিলেন। আমার ঠাকুর্দার জীবন-কাহিনী কেউ লিখবেন না জানি কিন্তু যদি কেউ কোনদিন লেখেন তাহলে আপনারা জানবেন সন্তান রঘুনাথের এই উপকারটুকু করার জন্যই হরি তাঁকে এতদিন কাছে টানেন নি। বাবা সি পি ডবলিউ ডি-তে জয়েন করার তিন দিন পরেই আমার পিতামহকে হরি নিজের কাছে টেনে নেন।

আমি আমার বাবার অষ্টম ও কনিষ্ঠতম সন্তান। আমরা ছ-বোন, দু ভাই। বাবার কর্মজীবনের প্রথম দিকের কিছুই আমার দেখার

সৌভাগ্য হয় নি। তবে দিদিদের কাছে শুনেছি সে সব দিনের কাহিনী। দিদিদের কাছে গল্প শুনেই বুঝতাম সামান্য চাকরি করলেও বাবার টাকার অভাব ছিল না। পঁচিশ-তিরিশ ভরি গহনা আর পাঁচ-দশ হাজার টাকা নগদ দিয়ে বাবা আমার ছ-দিদির বিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া আমাদের বিষ্ণুপুরের পৈতৃক ভিটায় পাকা দোতলা বাড়ি করেছেন। অঙ্কে আমি বরাবরই কাঁচা। তবু যোগ-বিয়োগ করে বুঝতে পারি বাবা কিভাবে ও কত রোজগার করেছেন। জাপানীরা বোধহয় বাবার উপকারের জন্যই যুদ্ধ লাগিয়েছিল। দিল্লী থেকে বহু দূরে পূর্ব ভারতের একান্তে বাবা বছরের পর বছর কাটিয়েছেন। ভূগোল পড়তে গিয়ে মানচিত্রে যে সব জায়গার হদিশ পাইনি, বাবা সে সব জায়গা চষে খেয়েছেন। প্রায় সারা কর্মজীবনই বাবা দিল্লীর বাইরে বাইরে কাটিয়েছেন। আমরা সবাই দিল্লী থাকতাম। বাবা বছরে দুতিনবার আসা যাওয়া করতেন। মিণ্টো রোডের দুর্গা পূজার থিয়েটারে বাবা প্রত্যেকবার প্রম্পটার হতেন।

মিণ্টো রোডের পুরানো বাসিন্দারা এখনও বাবাকে ভুলতে পারেন নি নানা কারণে। বিজয়ার পর খগেন জ্যেঠুকে যখন প্রণাম করতে যাই তখনই উনি বলবেন, রঘু সৎভাবে আয় না করলেও ব্যয় করতো সৎ কাজেই। আমরা তখন দুর্গাপূজায় দু'টাকা চাঁদা দিতাম আর তোর বাবা কত দিত জানিস?

কত?

দশ টাকা।

তাই নাকি?

এ ছাড়াও প্রত্যেক নবমীর রাত্রে যখন আমরা নাটক করতাম তখন রঘু আমাদের সবাইকে রুটি-মাংস খাওয়াতো। এখনও যখন মিণ্টো রোডের পূজা প্যাণ্ডেলে গিয়ে দাঁড়াই, তখনই তোর বাবার কথা মনে পড়ে।

জ্যেঠিমা এক প্লেট মিষ্টি এনে আমার হাতে দিতেই খগেন জ্যেঠু হাসতে হাসতে বললেন, আমাদের বৌভাতের রান্নাবান্নার সব দায়িত্ব কার উপর ছিল জানিস?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, না।

রঘু!

জ্যেঠিমাও সেদিনের স্মৃতি মনে করে হাসতে হাসতে বললেন, আমাকে দিয়েই তোর বাবা মাংস টেস্ট করিয়েছিলেন।

শুনে আমিও হাসি।

বাবা নিঃসন্দেহে খুব আমুদে লোক ছিলেন। যথেষ্ট হুজুগেও ছিলেন। যখন যা মাথায় চাপত তখন সেটা না করে থাকতেন না। শুনেছি আমার মেজদির বিয়ের দু'চার দিন পর কে যেন ওকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, রঘুনাথদা, এখনই তো প্রায় বুড়ো হতে চলেছ। সব মেয়েগুলোকে পার করে যেতে পারবে তো?

ব্যস! বাবা সঙ্গে সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করলেন, এই বুড়ো লোকটার ক্ষমতা একবার দেখবি নাকি?

উনি চিমটি কেটে বললেন, বৌদিকে আরেকবার লেডী হার্ডিঞ্জ হাসপাতালে পাঠিয়ে তোমার ক্ষমতা দেখাতে হবে না। যদি পার অন্য কিছু কেরামতী দেখাও।

বারান্দা থেকে সাইকেল এনে বাবা বললেন, এই চড়ছি। ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পরে নামব। তুই শুধু বসে থেকে তোর যৌবনের পরীক্ষা দে।

যে কথা সেই কাজ। চব্বিশ ঘণ্টা পরেই বাবা সাইকেল থেকে নেমেছিলেন।

এ ধরনের অনেক গুণ ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উনি অত্যন্ত স্বার্থ সচেতন ছিলেন। তাই তো দাদাকে সি পি ডবলিউ ডি-তে ঢুকিয়ে দেবার পর বাবা বলেছিলেন, ছাখ খোকা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলাম। এবার নিজের ভাল নিজে বুঝে নিস। তবে একটা কথা জেনে রাখিস দিল্লী থেকে যত দূরে থাকবি তত ভাল থাকবি।

তাই বলে তোমার মত সারা জীবন জঙ্গলে জঙ্গলে কাটাব নাকি?

যদি পয়সা রোজগার করতে চাও তাহলে তাই কাটাতে হবে। এখানকার মত চীফ এঞ্জিনিয়ার এ্যাকাউণ্টস অফিসার আর ভিজি-

ফ্যান্সের ভিড় মণিপুর-নাগাল্যাণ্ডের জঙ্গলে নেই বলেই আমি বেঁচে গেছি।

প্রথমে অনিচ্ছা থাকলেও শেষ পর্যন্ত দাদা বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। আমি অবশ্য প্রথম থেকেই ঠিক করেছিলাম সি পি ডবলিউ ডি-তে চাকরি করব না, দিল্লীও ছাড়ব না। তাছাড়া আমি বড় হতে না হতেই বাবা রিটায়ার করে বিষ্ণুপুর চলে গেলেন আর আমিও দরিয়াগঞ্জের একটা প্রাইভেট ফার্মে দেড়শ টাকার চাকরি পেয়ে গেলাম।

আজন্ম সরকারী চাকুরে দেখে ও সরকারী পরিবেশে মানুষ হবার জন্য সরকারী চাকরির প্রতি বরাবরই আমার লোভ ছিল। কলকাতা-বোম্বে-মাদ্রাজের লক্ষ লক্ষ মানুষ ছোট-বড় প্রাইভেট ফার্মে চাকুরি করেও কোন দৈন্য বোধ করেন না কিন্তু দিল্লীর পনের আনা মানুষের নজর সরকারী চাকরির প্রতি। কেন্দ্রীয় সরকারের স্নেহচ্ছায়ায় দিল্লী গড়ে উঠেছে বলে দিল্লীর মানুষগুলোর উপরেও সরকারী প্রভাব অপরিসীম। সরকারী কোয়ার্টার, সরকারী চাকরি, সরকারী বাস, সরকারী হাসপাতাল, সরকারী রেশন, সরকারী স্কুল, সরকারী উৎসব-অনুষ্ঠানের কৃপায় এখানকার মানুষগুলোই জন্ম থেকে সরকার ঘেঁষা। আমি নিজে ছোটবেলায় মিণ্টো রোড—কালীবাড়ির দুর্গা পূজায় দেখেছি আণ্ডার সেক্রেটারী-ডেপুটি সেক্রেটারী অষ্টমী পূজার অঞ্জলি দিতে এলে সরকারী আমলাদের কি উৎসাহ ও উল্লাস। দিল্লীর মানুষের এ চরিত্র এখনও বদলায় নি। একাধিক বাঙালী দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হয়েছেন কিন্তু কোন বেসরকারী মানুষের পক্ষে বেঙ্গল এসোসিয়েশনের সভাপতি হওয়া এখনও অসম্ভব। যে বাঙালী কলকাতায় বিপ্লবের বাণী ছড়িয়ে ভারতজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে সেই বাঙালীই দিল্লীতে এসে মিনিস্টার ছাড়া আর কাউকে বেঙ্গল এসোসিয়েশনের সভাপতি হবার যোগ্য বলে মনে করেন না। আমিও তো এদেরই একজন। সুতরাং দরিয়াগঞ্জের

প্রাইভেট ফার্মে কাজ করলেও নজর ছিল উদ্যোগ ভবন—কৃষি ভবন—রেল ভবনের দিকে।

বিষ্ণুপুর থেকে বাবার চিঠি এলেই আমি সান্ন্যাল মেশোমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য উদ্যোগ ভবনে যেতাম। বন্ধু-পুত্র বলে সস্নেহে কাছে বসিয়ে চা খাওয়াতেন। আমি অবাক হয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখতাম। বাইরে থেকে উদ্যোগ ভবন দেখে মনে মনে বিরাটত্বের স্বপ্ন দেখতাম, ভিতরে ঢুকে তার কোন পরিচয় পেতাম না আমি। ঘরগুলো ছোট ছোট। নোংরা। অন্ধকার। নানা ডিজাইনের ভাল মন্দ ফার্নিচার। নোংরা বিবর্ণ শত শত ফাইলের ভারে কাঠের র‍্যাকগুলো দশাশ্বমেধ ঘাটের বুড়োবুড়ীর মত কুঁজো হয়ে গেছে। দুপুর বারোটা-একটার সময়েও তিনটে-চারটে-পাঁচটা টিউব লাইট জ্বলছে। আমার মনে হতো সূর্যের আলো যত প্রখরই হোক উদ্যোগ ভবনের অন্ধকার দূর করার ক্ষমতা বা সাহস তার নেই। শত সহস্র স্বার্থপর মানুষের পুঞ্জীভূত দৈন্য ও হীনতার অন্ধকার দূর করার ক্ষমতা সূর্য কোথায় পাবে?

ক্যান্টিন থেকে চা আসতে অনেক দেরী হতো। সান্ন্যাল মেশোমশাই আপন মনে ফাইল পড়তেন, কিছু লিখতেন, ডান দিক থেকে বা দিকে রেখে আবার নতুন ফাইল খুলতেন। আমি চুপ করে বসে বসে অবাক বিস্ময়ে মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। দেখতাম কেউ ফাইল পড়ছেন, কেউ লিখছেন, কেউ বা গল্প করছেন অথবা মিট মিট করে চাপা হাসি হাসতে হাসতে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে আছেন। এখনকার মত তখন উদ্যোগ ভবনের যৌথ পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয় নি। সারা ভারতবর্ষের শিল্প-বাণিজ্যে সমস্ত দায়-দায়িত্ব ছিল মিনিষ্ট্রি অফ কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রির এবং উদ্যোগ ভবনই ছিল তার কেন্দ্রীয় কার্যালয়। অথচ আমার দরিয়াগঞ্জের ছোট্ট অফিসের অতি সাধারণ কর্মচারীদের মধ্যে যে ঐকান্তিকতা দেখতাম তার এক আনা ঐকান্তিকতা সান্ন্যাল মেশোমশাইয়ের অফিসের লোকজনের মধ্যে না দেখে আমি বিস্মিত হতাম। তাছাড়া ভাবতাম এরা কি শিল্প-

বাণিজ্যের কিছু বুঝেন, না জানেন। না বুঝে না জেনে এরা কি করে ফাইলে নোট লিখছেন? আমার মত ম্যাট্রিকুলেট অথবা অতি সাধারণভাবে আই. এ-বি. পাশ করে এরা ফাইলে কিভাবে মন্তব্য লিখছেন, দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যাণ্ট সুষ্ঠুভাবে চালাবার জন্য এখন পঁচিশ জন টেকনিসিয়ানকে বিলেত থেকে এক বছরের ট্রেনিং দেওয়াই যথেষ্ট। আর দরকার নেই। ঐ একই কেরানীবাবু পরের মাসে অন্য ব্রাঞ্চে বদলী হবার পর লিখছেন, এ্যামোনিয়া ফসফেটের প্রডাকশন আরো বাড়ালে ব্যবহার হবার সম্ভাবনা খুবই কম। সেজন্য........। এই ধরনের আরো কত কি ওরা নিত্য নোট দিচ্ছেন ফাইলে। সারা দেশ থেকে কত মানুষের কত দিনের চিন্তার ফলে তৈরী শত সহস্র প্রস্তাব এখানে সান্ন্যাল মেশোমশায়ের কেরানীদের হাতে পাঁচ মিনিটে নাকচ হয়ে যাচ্ছে ভাবতেই আমার কষ্ট হতো। আচ্ছা চাকরি পাবার পর এদের কী কোন ট্রেনিং হয়? ট্রেনিং-এর কথা শুনিনি কিন্তু ট্রেনিং না হলে এরা কাজ করেন কিভাবে?

চা আসত, খেতাম। তারপর সান্ন্যাল মেশোমশাইয়ের সঙ্গে দুটো-একটা কথা বলে চলে এলেও মনে মনে ভাবতাম যেখান থেকে সেখান থেকে ফাইল এলেই ওরা কি করে নোট লেখেন। অনেক ভেবেও কোন কূল-কিনারা পেতাম না। শেষে ভারত সরকারের আমলাদের অপরিসীম কর্মক্ষমতা ও দক্ষতার স্বীকৃতি না জানিয়ে পারতাম না। একদিন সান্ন্যাল মেশোমশাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা মেশোমশাই, যারা নতুন চাকরি পায় তাদের কী কোন ট্রেনিং দেওয়া হয়?

উনি মুখ না তুলেই একটু হাসলেন। বললেন, এখানে কে কাকে ট্রেনিং দেবে? একটু থেমে আবার বললেন, আমাদের মত কিছু সেকেলে লোক আছি বলে কোন মতে শিখিয়ে-পড়িয়ে নরমে-গরমে কাজ চালিয়ে নিচ্ছি। আমাদের মত বুড়োর দল রিটায়ার করার পর পয়লা তারিখে মাইনে হবে কিনা তাও বলতে পারি না।

আমি ভারত সরকারের সামান্য একজন কেরানী। সারা দেশের ভূত-ভবিষ্যৎ চিন্তা করার দায় বা দায়িত্ব আমার নয়। ক্ষমতাও নেই।

সকাল বেলায় খবরের কাগজ খুললেই দেখি শুধু আমি বা আমার মত কিছু আমলা ছাড়া সবাই দেশের কল্যাণ চিন্তায় সারা রাত্তির ঘুমুতে পারেন নি। আমাদের মত সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য কত লক্ষ মানুষ যে উঠে পড়ে লেগেছেন তার ঠিকঠিকানা নেই। দেশ ও দশের স্বার্থরক্ষার জন্য অতন্দ্র প্রহরীর সংখ্যা যত বাড়ছে, অন্যায় ও ব্যভিচারের মাত্রাও ততই বাড়ছে। বাইরের মানুষ না জানলেও আমরা জানি কি হচ্ছে। আমি আর নেপোদা রোজ ভোরবেলায় একসঙ্গে দুধের লাইনে দাঁড়াই। ঘণ্টাখানেক হা পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর মিল্ক ভ্যান আসে। দুধের টোকন থাকলেও দুধ পাবার কোন গ্যারাণ্টি নেই দিল্লীতে। গঙ্গা বলে, যে দেশে টিকিট থাকলেই রেলে চড়া যায় না, রেশন কার্ড থাকলেই নিয়মিত চাল-আটা পাওয়া যায় না, সে দেশে টোকন থাকলেই দুধ পাওয়া যাবে কেন? ভোর বেলার দুধের লাইনে দাঁড়িয়ে এসব কথা ছাড়া আরো কত কথা হয় নেপোদার সঙ্গে। জলাভাব, অর্থাভাব, রেলের গোলমাল, ডাকের গণ্ডগোল থেকে শুরু করে অফিসের ট্রান্সফার-প্রমোশন-ওভার টাইম ছাড়াও বিশ্ব সংসারের সবকিছু দুধের লাইনে দাঁড়িয়ে আমরা আলোচনা করি।

বিশ্বাস কর সোমনাথ, কোন মতে দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছি। ঘেন্না ধরে গেল সরকারী চাকরিতে।

জিজ্ঞাসা করি, নতুন কিছু হলো নাকি?

ছোটবেলায় বাপ-জ্যাঠার কাছে শিখেছিলাম সৎ পথে থাকলে একদিন না একদিন তার জয় হবেই কিন্তু এখন দেখছি সৎ হলেই বিপদে পড়তে হবে। অসৎ, বদমাইস না হলে এদেশে কারুর উন্নতি হবে না।

নেপোদা—নেপালচন্দ্র মুখার্জী একজন স্টেনোগ্রাফার। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ভারত সরকারের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ীর কাছে দু বছর কাজ করার পর রফি সাহেবের সঙ্গে কাজ

করেছেন দীর্ঘদিন। রফি সাহেব স্বেচ্ছায় ওকে এ্যাসিসট্যাণ্ট প্রাইভেট সেক্রেটারী করতে চেয়েছিলেন কিন্তু নেপোদা সকৃতজ্ঞ চিত্তে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, স্যার, আপনি যা বলবেন তাই করব কিন্তু ও ধরনের উন্নতি আমি চাই না।

রফি সাহেব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন?

নেপোদা বলেছিলেন, স্যার, যদি কোনদিন কোন কারণে আপনি মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেন, তাহলে আবার আমাকে ঐ নোট বই আর টাইপ রাইটার নিয়েই তো জীবন কাটাতে হবে।

রফি সাহেব আর কোন কথা বলেন নি কিন্তু মনে মনে বুঝেছিলেন নেপালচন্দ্র মুখার্জী অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। রফি সাহেব নেপালদাকে সত্যি খুব ভালবাসতেন। বোধহয় শ্রদ্ধাও করতেন। কাশ্মীর নিয়ে পণ্ডিতজীর সঙ্গে রফি সাহেবের মতবিরোধের কথা এখনও মাঝে মাঝে খবরের কাগজে পড়ি। কাশ্মীর সম্পর্কে পণ্ডিতজীকে লেখা রফি সাহেবের সেসব চিঠিপত্র নেপোদাই টাইপ করেছিলেন। সত্যিকার গোপন কথা ফাঁস করে দেবার অভ্যাস নেপোদার নেই। তাই সেসব ঐতিহাসিক চিঠির বিষয়বস্তু কখনও কাউকে বলেন না। কদাচিৎ কখনও আক্ষেপ করে বলেন, তখন বুঝতে পারিনি কিন্তু এখন মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি, রফি সাহেব ঠিকই বলতেন। তাঁর প্রত্যেকটা ভবিষ্যৎ-বাণী বর্ণে বর্ণে ফলেছে।

নেপোদা নিছক একজন ভদ্রলোক। আমি, কেশব দত্ত, কেষ্ট ঘোষ বা ইন্দুদা পরনিন্দা পরচর্চা না করে একটা দিন থাকতে পারি না কিন্তু নেপোদার ও রোগ নেই। অফিস আর বাড়ি, বাড়ি আর অফিস ছাড়া উনি আর কিছু জানেন না। রোজ সন্ধ্যের পর পরিপাটি হয়ে সেজেগুজে কর্তা-গিন্নীতে একসঙ্গে ঘণ্টা খানেক বেড়ান ছাড়া নেপোদার আর কোন সখ নেই।

ওদের সান্ধ্য ভ্রমণের সময় দেখা হলে আমি ঠাট্টা করে বলি জানেন বৌদি, একটু ঝাপসা অন্ধকারে আপনাকে দেখলে মনেই হয় না আপনার ছেলে এম-এস-সি পড়ে আর মেয়ে এবার বি-এ পরীক্ষা দেবে।

বৌদি হাসতে হাসতে বল্লেন, আপনার দাদা কি বল্লেন জানেন?

কী?

বল্লেন, টাইপ করা চিঠিতে যদি কাটাকুটি থাকে আর বাড়ির বউ যদি একটু সেজেগুজে না থাকে তাহলে........

বৌদির কথায় গঙ্গা এমন জোরে হেসে ওঠে যে পুরো কথাটা শুনতে পাই না।

মিল্ক বুথের চারপাশে বেশ ভিড় জমে উঠেছে। পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মেয়েদের লাইনটাও মিনিটে মিনিটে বাড়ছে। নেপোদা একবার আমাদের লাইনটাকে ভালভাবে দেখে নিয়ে বললেন, এসব কথা আমি কাউকে বলতে চাই না কিন্তু সত্যি যা দেখছি তা সহ্য করা যায় না।

ঐ দুধের লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নেপোদার কাছে রঙ্গমঞ্চের নেপথ্য কাহিনী শুনি।

ভারতবর্ষে যাঁরা শিল্প বিপ্লব এনেছিলেন নিউ ভারত স্টীল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠাতা তার অন্যতম। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের অবদান অনস্বীকার্য। প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষভাবে লক্ষাধিক মানুষের অন্ন সংস্থান হয় এই একটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। এসব খবর আমিও রাখি। সবাই রাখেন। অর্ধ শতাব্দীর উপর যে প্রতিষ্ঠান জাতির গর্ব ছিল তাব বিপর্যয়ের ইতিহাসও অজ্ঞাত থাকে না। লক্ষাধিক মানুষ চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটালেন বছরের পর বছর। এতবড় প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন এলো চারদিক থেকে। দীর্ঘদিন পরে যখন কেন্দ্রীয় সরকারের কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হলো তখন লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে বহুদিনের উৎকণ্ঠার উপশম হয়ে খুশীর বন্যা বয়ে গেল।

ফিস ফিস করেই নেপোদা আমাকে এসব কথা বলছিলেন। তারপর হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, জান সোমনাথ তারপর কি হলো?

মুখে কিছু বললাম না। মাথা নেড়ে বললাম, না জানি না।

উপরতলার ডিরেকটর-টিরেকটর রদ-বদলের পর আমাদের মিনিস্টার সাহেবের কাছে হাজার রকম চুরি-জোচ্চুরির খবর আসতে লাগল। একটু খোঁজ-খবর নিতেই অনেক কিছু জানা গেল। তুমি শুনলে অবাক হবে সোমনাথ যে দশ বছর আগে স্ক্র্যাপ বিক্রীর জন্য নিলামদার নিয়োগ করা হলেও কোটি কোটি টাকার মাল বিনা নিলামেই বিক্রী হচ্ছিল।....

বলেন কী নেপোদা?

যা বলছি শুনে যাও। প্রত্যেক ছ'মাস পর পরই দেড় থেকে দু কোটি টাকার স্ক্র্যাপ বিনা নিলামেই পুরনো কর্তাদের এক প্রিয়পাত্র ব্যবসাদারকে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকায় দিয়ে দেওয়া হতো।....

আমি অবাক হয়ে বলি, সে কী?

অবাক হয়ো না সোমনাথ। তোমাদের দুর্গাপুর-ভিলাই-রাউরকেলার কোটি কোটি টাকার স্ক্র্যাপও এইভাবে জলের দামে বিক্রী হয় আর নিউ ভারত স্টীল ওয়ার্কসের মতন ওখানকার বহু কর্তাব্যক্তিদের পকেটেই...

ভোরবেলায় দুধের লাইনে দাঁড়িয়েও দুধের চিন্তা ভুলে যাই। বিস্বাদে মুখটা তেতো হয়ে যায়। বলি, ছি ছি নেপোদা, এ হতচ্ছাড়া দেশে কিচ্ছু হবে না।

নেপোদা একটু হেসে বললেন, তুমি আগের থেকেই এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? আগে সবটা শুনে নাও তারপর কথা বলো।

এরপর আরো আছে?

নেপোদা আবার আপন মনে বলে চললেন, এক একবার স্ক্র্যাপ বিক্রীর পর তিরিশ থেকে চল্লিশ লাখ টাকা বহু কর্তা আর লীডারদের পকেটে যেতো। বহু বাদ-প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে মিনিস্টার সাহেব ঐভাবে নিলাম না করে কোটি কোটি টাকার স্ক্র্যাপ বিক্রী বন্ধ করে দিতেই চোর-জোচ্চরগুলো একজোট হয়ে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে লাগল।...

তাই কী....

ঐ স্ক্র্যাপ বিক্রীর লাখ-লাখ কোটি কোটি টাকা যে কত সুড়ঙ্গ পথ

দিয়ে কত দিকে কত জনের কাছে পৌঁছায় তা তোমাকে বলতে পারব না। শুধু জেনে রাখ ঐ চোর-জোচ্চরগুলোকে খুশী করার জন্যই আমাদের মন্ত্রীকে দিল্লী থেকে নির্বাসনে যেতে হলো।

শুনে আমি স্তম্ভিত। আর কোন প্রশ্ন করার মত অবস্থা আমার ছিল না।

নেপোদা হাত দিয়ে আমার মাথাটা ওর মুখের কাছে টেনে নিয়ে খুব চাপা গলায় বললেন, দিল্লী-বোম্বে-কলকাতা ছুটাছুটি করে এই কাজটি কে হাসিল করলেন জান?

কে?

বোম্বের ফেমাস ফিল্ম এ্যাকট্রেস মৃণালিনী রায়।

মিল্ক ভ্যান এসে যেতেই এত চেঁচামিচি আর ঠেলাঠেলি শুরু হলো যে আমি আর নেপোদাকে কোন কথা বলার সুযোগ পেলাম না।

দুই

দুধের বোতল নিয়ে বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই গঙ্গা বলে, নিশ্চই কারুর সঙ্গে গল্প জমিয়েছিলে?

আমি দুধের বোতল দুটো ডাইনিং টেবিলের উপর রাখতে রাখতে জিজ্ঞাসা করি, এতক্ষণ আমাকে দেখতে পাওনি বলে মন খারাপ লাগছিল?

চিলের মত ছোঁ মেরে একটা দুধের বোতল তুলে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকতে ঢুকতে গঙ্গা বললো, ভীষণ!

আমি হাসতে হাসতে খবরের কাগজখানা তুলে নিয়ে বাইরের ঘরে চলে যাই। একটু পরেই গঙ্গা দু'কাপ চা নিয়ে আসে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই আমি বললাম, তুমি যদি বস্তির মেয়ে না হতে তাহলে আর নিজে হাতে চা বানিয়ে খেতে হতো না।

গঙ্গা একটু বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করল, কেন?

চায়ের কাপে পর পর দুবার চুমুক দিয়ে বললাম, বামুন-কায়েতের মেয়ে হলে তোমাকে আর আমি পেতাম না। তোমাদের বস্তিদের মধ্যে এত বেশী নগদ দিতে হয় যে····

বাজে বকো না।

ঐ নগদের ঝামেলা ছিল বলেই তোমরা দুটি বোন স্বয়ম্বর সভায় বর পছন্দ করলেও তোমার বাবা-মা আপত্তি করেন নি।

আমাদের ফ্যামিলী তোমাদের মত কনজারভেটিভ না।

বিনা খরচে ভদ্র-সভ্য জামাই পেলে কে না প্রগ্রেসিভ হবে?

তা তো বটেই। আমি যদি আগে জানতাম তুমি এমন অসভ্য আর কামুক তাহলে কিছুতেই তোমাকে আমি বিয়ে করতাম না।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, জান গঙ্গা কেরানী আর স্কুল মাস্টার মাত্রেই কামুক হবে।

গঙ্গা চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোমাকে কে বললো?

কেরানী আর স্কুল মাস্টারের চাইতে লয়াল হাসব্যাণ্ড........

গঙ্গা মাঝপথেই বাধা দিয়ে বললো, অন্য কোন জায়গায় তোমাদের বাঁদরামী করার সুযোগ তো কম তাই তোমরা লয়াল।

কে বললো আমাদের সুযোগ নেই?

মোস্ট অপদার্থ স্বামীও স্ত্রীর কাছ থেকে ষোল আনা উসুল করে নিতে পারে কিন্তু অন্য মেয়েদের কাছে তো এত সহজে চিঁড়ে ভিজবে না।

তার মানে?

তার মানে অন্য মেয়েদের কাছে ভিড়তে হলে যেমন সাহস তেমনি পকেটে কিছু মালকড়ি থাকা দরকার।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা তোমাদের মত মেয়েদের তো অনেক সুযোগ, তাই না?

গঙ্গার চা খাওয়াও শেষ। তবু পাশে বসে বসে কথা বলে যায়, তুমি সত্যি ভারী অসভ্য। সব সময় তোমার মনে কি এইসব চিন্তা ছাড়া আর কিছু আসে না?

অর্থহীন প্রলাপ বকে যাই দুজনেই। তারপর ও বলে, তোমার সঙ্গে বকবক করে চায়ের আমেজটাই নষ্ট হয়ে গেল।

ঠিক বলেছ। চট করে দু'কাপ চা করে....

গঙ্গা হাসে। বলে, সকাল থেকে শুধু চা খাই আর তোমার সঙ্গে বকবক করি, কি বল?

আজ দুজনেই ডুব মারি, কি বল?

তুমি দিও।— ..

আর দাঁড়ায় না গঙ্গা। খালি কাপ দুটো নিয়ে রান্না ঘরে যায়। দু'পাঁচ মিনিট পরে দু'কাপ চা নিয়ে আবার আমার পাশে এসে বসে। একটু কষ্ট করে মুখের হাসি লুকিয়ে রেখে বলে, এবার চা খাওয়া শেষ হলেই দুজনকে উঠতে হবে।

নিশ্চয়ই।

তবু দুজনেই কথা বলি। নানা কথা। আমি বলি, গঙ্গা শোনে, ও বলে, আমি শুনি।

হ্যাগো, কেদার-বদ্রী গেলে কেমন হয়?

গঙ্গা অবাক হয় আমার কথায়। বলে, হঠাৎ কেদার-বদ্রী যাবার কথা তোমার মাথায় এলো কেন?

কাল অফিসে কেদার-বদ্রীর গল্প শুনছিলাম।....

কেউ গিয়েছিলেন বুঝি?

আমাদের পাশের ঘরের এক ভদ্রলোক স্ত্রী আর মাকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

শুনেছি খুব সুন্দর জায়গা।

উনিও বলছিলেন যে না দেখলে অনুভব করা যায় না।

কিন্তু ভীষণ কষ্টের, তাই না?

না, না, তেমন কষ্টেরও না। বোধহয় কেদার পর্যন্ত বাসেই যাওয়া যায়। ইউ পি. গভর্ণমেণ্টের বাসে ভাড়াও খুব বেশী না।

দুজনেরই চা খাওয়া শেষ। তবু ও জিজ্ঞাসা করল, খরচ কি রকম পড়ে শুনলে?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, রোজ কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এয়ার ইণ্ডিয়া বলছে সস্তায় নিউইয়র্ক ঘুরিয়ে আনবে। আমরা কেরানীরা এয়ার ইণ্ডিয়ার বিজ্ঞাপন নিয়ে আলোচনা করি না। যেখানে বেশী খরচের ব্যাপার সেখানে আমরা নেই।

গঙ্গা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এত কথা বললে কিন্তু কত খরচ পড়ে তা বললে না। এই হচ্ছো তুমি!

গঙ্গা আর দাঁড়ায় না। দুটো খালি কাপ-ডিশ নিয়ে রান্না ঘরে চলে যায়। আমিও উঠে দাঁড়াই।

হঠাৎ গঙ্গা প্রায় ছুটে আসে আমার কাছে। চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, জান মায়াদির ছেলেটার লিউকিমিয়া হয়েছে।

সে কি?

হ্যাগো! পরশু দিনই ধরা পড়েছে আর ডাক্তার বলেছে মাস দেড়েকের বেশী বাঁচবে না।

আমি মুখ বিকৃত না করে পারি না। আবার বলি, কি বলছ তুমি?

আমিও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি........

তুমি কখন শুনলে?

আমি কালই নন্দী মেশোমশাইয়ের কাছে শুনলাম।

কাল আমাকে বললে না কেন?

কাল অফিস থেকে এসেই ভীষণ মাথা ধরেছে বলে শুয়ে পড়লে বলে......

গঙ্গা পুরো কথাটা শেষ করল না। আমিও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম ওর সামনে।

মনে পড়ল ক'বছর আগেকার কথা। ঠিক আমাদের বিয়ের আগের কথা।

নন্দীদা টানতে টানতে আমাকে ওর কোয়ার্টারে নিয়ে যেতেই বৌদি আমাকে বললেন, তুমি তো আচ্ছা লোক ভাই!

কেন বৌদি?

এমন একটা ভাব দেখাচ্ছ যেন এই পৃথিবীতে তুমিই প্রথম প্রেম করে বিয়ে করছ।

হঠাৎ একথা বলছেন কেন?

তুমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ বলেই বলছি।

আমি মাথা নীচু করে হাসি।

বৌদি আবার বললেন, তুমি চুরি করছ নাকি ডাকাতি করছ যে এমন করে লুকিয়ে লুকিয়ে....

মাথা নীচু করেই আমি বললাম, তা না তবে····

তবে আবার কি?

গঙ্গা আমার চাইতে বেশী লেখাপড়া জানে বলে

তাতে কি হলো?

কিছু লোক ফিসফিস করে ··

বৌদির সাফ কথা, ওসব লোকের মুখে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিতে পার না। তোমার বউ লেখাপড়া বেশী বা কম জানুক, তাতে ওদের কি?

যে যত বীর পুরুষই হোক বিয়ের আগে সবাই একটু লাজুক হবেই। অনেকে বলে ছেলেরা বোকা বোকা হয়ে যায়। আমি কি হয়েছিলাম জানি না কিন্তু নন্দী বৌদির কাছে বলতে পারলাম না কে বা কারা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে।

হঠাৎ বৌদি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি রেজেস্ট্রী ম্যারেজ করবে নাকি?

খুব চাপা গলায় বললাম, রেজেস্ট্রী হলেও আনুষ্ঠানিক সবকিছুই হবে।

খুব ভাল কথা। আমি আর তোমার দাদা উইটনেস হবো।

নন্দীদা জুতা-মোজা খুলে, বুশ সার্টের বোতামগুলো খুলতে খুলতে বললেন, তুমি জান তো সোমনাথ, গঙ্গা আমাদের বাড়িতে খুব পপুলার।

জানি।

তোমার অন্য শালীরা কিন্তু আমাদের বাড়িতে অত পপুলার নয়।

বিয়ের পর এই নন্দীদার কোয়ার্টারেই একখানা ঘর নিয়ে আমরা ছ'মাস ছিলাম। মানিক তখন মাত্র বছর খানেকের।

দু'জনে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই মানিকের কথাই ভাবছিলাম।

গঙ্গা বললো, যে মানিক রোজ আমার কোলে ঘুমুতো. এখন কিভাবে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াব, তা ভাবতেই পারছি না।

তোমার মনে আছে গঙ্গা, ও গত বছর জন্মদিনে তোমাকে কি বলেছিল ?

গঙ্গা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো. ওসব কথা আর মনে করিয়ে দিও না। যাই হোক আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি এসো। ওকে দেখতে যেতে হবে।

হ্যাঁ, আসব।

সুখ-দুঃখের কত কথা বলাবলি করেই আমাদের দিন শুরু হয়। মোটকথা, রোজ সকালবেলায় চা খেতে খেতে আমরা দুজনে একটু গল্পগুজব করবই। রবিবার বা ছুটির দিন হলে তো কথাই নেই। রোজ সকাল সকাল উঠতে হয় বলে ছুটির দিন গঙ্গা বেশ বেলা পর্যন্ত শুয়ে থাকে। আমি দুধ এনে আবার এক্টু গঙ্গার পাশে শুয়ে পড়ি। গঙ্গা আপত্তি করে না কিন্তু বলে, তুমি যে যখন-তখন আমার কাছে শুয়ে পড় ছেলেমেয়ে থাকলে কি করতে বল তো ?

অক্টোপাশের মত গঙ্গাকে জড়িয়ে ধরে বলি, খুব জোরে একবার বকুনি দিয়ে পড়তে পাঠিয়ে দিতাম।

গঙ্গা হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে, ছেলেমেয়েকে পড়তে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি আমার কাছে শুয়ে থাকতে, তাই না ?

নিশ্চয়ই।

আমি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যাই। কোন কথা বলি না। গঙ্গাও চুপ করে থাকে। তারপর জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা গঙ্গা ছেলেমেয়ে না হবার জন্য তোমার খুব দুঃখ তাই না ?

ও আর আমার দিকে তাকায় না। পর্দা সরিয়ে জানলার মধ্য দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, ছেলেমেয়ে হলেই কী সবাই সুখী হয়? তোমাদের বঙ্কিমদার মত ছেলেমেয়ে হলে তো আত্মহত্যা করেও শান্তি পেতাম না।

আমি বলি, তোমার ছেলেমেয়েও যে বঙ্কিমদার ছেলেমেয়ের মতই হতো তার কি কারণ আছে?

ও জবাব দেয়, হতো না তারই বা কি কারণ আছে?

তা ঠিক। তবে তুমি খারাপটাই শুধু ভাববে কেন?

খারাপটাই তো আগে মনে আসে। ক'জনের ভাগ্যে ভাল ছেলেমেয়ে হয় বল তো? আর হলেও যে তারা মানিকের মত ফাঁকি দেবে না····

আমি তাড়াতাড়ি ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলি, হয়ত তোমার কাছে আসবে বলেই মানিক ঐভাবে বৌদির কাছ থেকে চলে গেল।

না, না, ওকে আমার দরকার নেই।

একি কথা বলছ? ও তোমাকে এত···

যে একজন মাকে ফাঁকি দিতে পারে, সে আমাকেও নিশ্চয় ফাঁকি দেবে। ওসব শত্রুদের আমি পেটে ধরতে পারব না।

ছি গঙ্গা! ও কথা বলে না।

গঙ্গা একটু হাসল। বললো, তোমাদের নিয়ে এইত মুস্কিল। তোমরা যদি মেয়েদের দুঃখ বুঝতে তাহলে আর····

সে যাই হোক তুমি ও কথা আর বলো না।

আচ্ছা বলব না। কিন্তু····

কিন্তু কি?

তুমি বললেই কি ও আমার কাছে আসবে!

আমি চুপ। আর কিছু বলতে পারি না।

ছেলেমেয়ের কথা উঠলেই গঙ্গা সব সময় বঙ্কিমদার ছেলেমেয়ের কথা বলে। বলার কারণ আছে। সামনা-সামনি বাড়ি। সব সময়

সব কিছু দেখছে, শুনছে। মাঝে মাঝেই বঙ্কিমদার স্ত্রী এসে ওর কাছে কান্নাকাটি করেন। তাই ওদের কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। আমারও মনে হয়। বঙ্কিমদা এক কালে এরিয়ান্সের সেন্টার ফরোয়ার্ড ছিলেন। ঐ খেলার জন্যই রেলের চাকরি পান। বিয়েও করেন এক খেলোয়াড় বন্ধুর বোনকে। ইন্টার-কাস্ট। কলকাতা ছেড়ে চলে আসতে হয় দিল্লীতে। এখানেও রেল কোম্পানীর খেলোয়াড়দের তদারকী করাই তার কাজ ছিল বহুকাল। রেল কোম্পানীর খেলোয়াড়দের নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন সারা ভারতবর্ষ। কখনও ফুটবল, কখনও ক্রিকেট বা হকি। এ্যাথলেটিক টিম নিয়েও যেতে হতো খড়্গপুর-জামালপুর ও আরো কত জায়গা। বছরের মধ্যে ছয় মাসই বঙ্কিমদা বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতেন। যখনই বৌদিকে জিজ্ঞাসা করতাম, কি বৌদি, বঙ্কিমদা আছেন নাকি, তখনই উনি পাল্টা প্রশ্ন করতেন, আপনাদের দাদা দিল্লীতে থাকেন নাকি? তারপর দাদা একদিন ফিরে আসতেন। কাপ-শীল্ড জিতলে খেলোয়াড়দের নিয়ে রেল মন্ত্রীর পাশে বসে ছবি তুলতেন নয়ত রেল ভবনের করিডরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্রীড়ামোদী বন্ধুদের বলতেন, খেলাধুলার জন্যও সাধনা করতে হয় কিন্তু আমাদের ছেলেরা খেলাধুলাকে নিয়ে চ্যাংড়ামি করে। এরপর অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে উনি ভিজিল্যান্স ইন্সপেকটর হলেন। মাইনে বাড়ল ঠিকই কিন্তু ঘুরাঘুরি কমল না। রেলের চুরি জোচ্চুরির তদন্তের জন্য ছুটে বেড়াতে হয় সারা ভারতবর্ষ। প্রতি মাসে পনের-বিশ দিন।

নিজে খেলোয়াড় বলে বঙ্কিমদা তিন ছেলেমেয়েকেই ছোটবেলা থেকে খেলাধূলায় উৎসাহ দিতেন। বড় মেয়ে রমা স্কুলে থাকতেই হাই জাম্পে খুব নাম করল। প্রথমে ইন্টার স্কুল, পরে দিল্লী ইউনিভার্সিটি ও স্টেটের টিমের সদস্যা হয়ে বাইরে যেতে শুরু করল। বঙ্কিমদার ড্রইং রুমে দিনে দিনে রমার কাপ-মেডেলের সংখ্যা বাড়তে লাগল। ছোট ছেলেটা বিশেষ সুবিধা করতে না পারলেও বড় ছেলে খুব ভাল ফুটবল খেলত। বঙ্কিমদা খুব বেশী খুশী কিন্তু ওর

অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে রমা আর দীপু খেলাধুলার নাম করে মাকে মিথ্যে কথা বলে প্রায় সারা দিনই বাড়ির বাইরে কাটাতে শুরু করল। অনেক কিছু কীর্তি করার পর রমা এখন একটা হোটেলে রিসেপসনিস্টের চাকরি করছে। সকালেই যাক আর দুপুরেই যাক, ফিরবে মাঝ রাত্তিরে। স্কুটার, মোটর সাইকেল বা গাড়িতে করে কেউ না কেউ নামিয়ে দিয়ে যায়। আমাদের কেরানী পাড়ার ঘরে ঘরে রমাকে নিয়ে সরস আলোচনা লেগেই আছে। দীপু লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করবে বলে বাবার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের কয়েক হাজার টাকা ধ্বংস করে এখন প্রায় হিপি হয়ে যত্র-তত্র বিচরণ করে বেড়াচ্ছে শুধু ছোট ছেলেটাই এখনও পড়াশুনা করছে। সামনের বার বি-কম দেবে। পাশ করলে হয়ত বঙ্কিমদা আর বৌদির দুঃখ একটু ঘুচবে। বড় দুটি ছেলেমেয়ের জন্য লজ্জায় বৌদি কোথাও যেতে পারেন না। এমন কী অষ্টমী পূজার দিন পূজা প্যাণ্ডেলেও বৌদিকে দেখতে পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে শুধু গঙ্গার কাছে এসে খানিকটা চোখের জল ফেলে যান।

বঙ্কিমদাও মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি আসেন। একথা-সেকথার পর কোন কারণে ছেলেমেয়ের কথা উঠলেই গঙ্গাকে বলেন, ছেলেমেয়ে নেই বলে তোমার এক দুঃখ কিন্তু ছেলেমেয়ে হবার জন্য আমাদের হাজার দুঃখ। ধানবাদ গিয়েছিলাম কিসের ইনভেস্টিগেশনের জন্য জান?

কিসের? আমি জানতে চাইলাম

রেলওয়ে বোর্ডে পর পর কয়েকটা রিপোর্ট এলো যে ধানবাদের ডিভিশন্যাল সুপারিনটেনডেণ্ট তার পাশ বিক্রী করছেন। ইনভেস্টিগেশন করতে গিয়ে দেখি পাশ বিক্রী হয়েছে ঠিকই তবে ডিভিশন্যাল সুপারিনটেনডেণ্ট করেন নি। করেছে তাঁর কুলাঙ্গার পুত্র।

বঙ্কিমদা একটু থামলেন। বোধহয় একবার নিজের ছেলেমেয়ের কথা ভাবলেন। তারপর বললেন, আমি ডি এস সাহেবের সঙ্গে দেখা করতেই উনি নিজে সব কথা খুলে বললেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি রিপোর্ট দিলেন?

শুনতে চাও?

যদি আপনার আপত্তি না থাকে

না, না, আমার আবার আপত্তি কি থাকবে? আমি রিপোর্ট দিয়েছি ওর এক চাকর এই কাজ করছিল এবং সাহেব টের পেয়েছেন জেনেই পালিয়ে গেছে। বঙ্কিমদা হঠাৎ একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমিও তো ঐ রকমই একটা বাঁদর ছেলেকে নিয়ে ঘর করি। জানি আমি কত অসহায়। তাই কিছুতেই ওকে দোষী করতে পারলাম না।

ছেলেমেয়ের কথা উঠলেই নানা কথা এসে পড়ে। গঙ্গার মত আমারও মন খারাপ হয়। তাই তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টে বলি, চল, চল মর্নিং শোতে সিনেমা দেখে আসি।

অফিস থাকলে এত কথাবার্তা হয় না। দু চারটে কাজের কথা বা ব্যক্তিগত কথা হবার পরই গঙ্গা রান্নাঘরে যায়। আমিও সেভিং সেট এনে দাঁড়ি কামাতে শুরু করি। তারপর স্নান। কোনদিন আমি আগে, কোনদিন গঙ্গা আগে। কোন কোনদিন দুজনেই একসঙ্গে বাথরুমের সামনে হাজির হই। আমি বলি, চল, একসঙ্গেই স্নান করি।

যত তোমার বয়স হচ্ছে, তত বেশী তুমি অসভ্য হচ্ছ কেন বল তো?

আমি অত্যন্ত সরল হবার চেষ্টা করে বলি, এতে অসভ্যতার কি আছে? ইউরোপ-আমেরিকায় হাজার হাজার মেয়েপুরুষ একসঙ্গে সমুদ্রে স্নান করে। জাপানে উলঙ্গ মেয়ে-পুরুষদের একসঙ্গে স্নান করা খুব পপুলার ব্যাপার।

গঙ্গা আমাকে এক ধাক্কা দিয়ে বাথরুমে ঢুকতে ঢুকতে বললো, ফূর্তি করার বেলায় ইউরোপ-আমেরিকার কথা মনে হয় আর অফিসে ফাঁকি দেবার বেলায় এক নম্বরের ইণ্ডিয়ান!

গঙ্গা বরাবরই আমাকে একটু-আধটু শাসন করে। বিয়ের আগেও করতো, এখনও করে। আমি ঠাট্টা করে বলি, গঙ্গা, তোমার মত

একজন সুন্দরী যুবতী যদি আমার সেক্‌সন অফিসার হতো তাহলে বকুনি খেয়েও মন ভরে যেত।

সেক্‌সন অফিসার না হলেও সুন্দরী যুবতীর তো অভাব নেই তোমাদের অফিসে।

বেল পাকলে কাকের কী?

কেন তোমাদের সেকসনের মীনা?

মীনার নাম শুনে আমি হাসি।

সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা মন্তব্য করল, মীনার নাম শুনেই খুশীতে আটখানা!

আমি কিজন্য হাসলাম আর তুমি কি ভাবলে।

যা ভাবার তাই আমি ভেবেছি।

সকালবেলায় সব কিছুই সংক্ষিপ্ত। হাসি-ঠাট্টা, গল্পগুজবে, এমন কী ঝগড়া হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। আমার অফিস আর ওর স্কুল যাবার তাড়া থাকে। তবে স্নান করে জামা-কাপড় পরার সময় একটু কথা কাটাকাটি হবেই। আমি সামনে যা পাই তাই পরি। গঙ্গা ভীষণ রেগে যায়। বলে, এই নোংরা জামা-প্যান্ট পরে গিয়ে কি অফিসের সবাইকে বুঝাতে চাও তোমাকে আমি দেখাশুনা করি না।

ওরে বাপু, যা সামনে পেয়েছি তাই পরেছি।

এই নোংরা জামা-প্যান্ট পরে তুমি অফিস যাবে না

কিন্তু ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে দেখবে?

কোন দরকার নেই।

ন'টা বাজতে দশ।

বাজুক।

তুমি তো বাজুক বললে কিন্তু····

খাবার-দাবার ঠিক করতে করতেই গঙ্গা বলে, একটু দেরী হলে বকুনি খাবে, তাই না?

আমি হাসি।

তোমরা কি অফিসে কাজকর্ম কর যে একটু দেরী হলে....

কাজকর্ম না করলে অফিসগুলো চলছে কিভাবে ?

থাক্ থাক্। গভর্ণমেণ্ট অফিসে কাজের বহর খুব জানা আছে। মাসে মাসে ভাড়া নিয়ে নেবার পরও তো ছ'শ টাকা ভাড়া চেয়ে বিল এসেছে।

ও এস্টেট অফিস বা সি-পি ডবলিউ-ডি'র কথা বাদ দাও।

ওরা ফাঁকি দেয় আর তোমরা কাজ করতে করতে পাগল হয়ে যাচ্ছ, তাই না ?

ডাইনিং টেবিলে থালা দুটো রেখেই গঙ্গা বললো, খেয়ে নাও কিন্তু জামা-প্যান্ট না বদলে অফিস যেতে পারবে না।

আজ তো শনিবার।

শনিবার বলে কি নোংরা থাকতে হয় ?

আমার পোষাক-আষাকের ব্যাপারে গঙ্গা খুব সচেতন। কোন প্যান্টের সঙ্গে কোন বুশ সার্ট পরলে মানাবে, সেসব হিসেব করেই ও আমার জামা-প্যান্ট তৈরী করতে দেয়। আমি টাকাকড়ির হিসেব ছাড়া আর কোন হিসেব বুঝি না। জামা-কাপড়ের ব্যাপারে আমি খুবই উদাসীন। তাছাড়া এত সাধারণ চাকরি করি যে বেশী বাবুগিরি করতে লজ্জা করে। আরো একটা কারণ আছে। উদ্যোগ ভবনে চাকরি করে বেশী ভাল জামাকাপড় পরলেই বহুজনে সন্দেহ করবেন যে আমি ঘুষ খাই। গণাদার সঙ্গে যখনই দেখা হয় তখনই নিজের দোষ ঢাকবার জন্য আগে থেকেই বলবেন, সোমনাথ, খুব সস্তার জামার ছিট কিনবে ?

আমি হাসতে হাসতে বলি, গণাদা, সবাই কি আপনার মত সংসারী যে মাসের থার্ড উইকে....

এই হচ্ছে তোমাদের দোষ। সব ব্যাপারেই এমন ইকনমিক থিওরি আওড়াতে শুরু করবে যে কোন কিছু বলাই বিবাদ।

কি করব গণাদা ?....

নিজের জামাটা দেখিয়ে বললেন, এই কাপড়ের কত করে মিটার জান ?

কত ?

সাড়ে সাত টাকা।

বলেন কি ?

তবে কি তোমাকে এমনি এমনি বলছি

কোথায় বিক্রী হচ্ছে ?

গণাদা দাঁত বের করে বললেন, এত সস্তায় কি বাইরে টেরিকটের কাপড় পাওয়া যায় ? মিলের অফিসাররা পায়।

আমতা আমতা করে আমি বলি, কিন্তু আমি····

এবার গণাদা বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে বললেন, গণেন রায়-চৌধুরীর এইটুকু জানাশুনা না থাকলে এতকাল উদ্যোগ ভবনে কাটালাম কেন ?

গণাদার কথা যখন লাঞ্চের আড্ডায় বলি তখন ইন্দুদা বলেন, ও শালা এত ঘুষ খায় যে ক্লাশ-ফ্রেণ্ড বলে পরিচয় দিতেও লজ্জা করে।

আমরা হাসি।

আমাদের হাসি দেখে ইন্দুদা আবার বললেন, আরে হাসির কথা নয়, সত্যি গণা দারুণ ঘুষ খায়। তবে শালা ঘুঘু আছে। নগদ মালকড়ি বিশেষ নেয় না।

কলকাতার তুলনায় দিল্লীর কেরানীবাবুরা প্রায় সাহেব সেজে অফিসে আসেন। খুব দামী না হলেও প্রায় সবাই ফিটফাট হয়েই আসেন। কিছু কিছু কেরানীবাবুর জামা-কাপড় দেখে মনেই হয় না এরা সরকারী কর্মচারী। আমাদেরই এক বন্ধু ফরেন কোলাবোরেশন সেল'এ আপার ডিভিশন ক্লার্ক। ও প্রায় রোজই বিদেশী জামা-কাপড় পরে অফিসে আসে। কেউ জিজ্ঞাসা করলেই বলবে, ক্যানাডা থেকে দাদা বা শালা পাঠিয়েছে। কেশব দত্ত বলেন, ক্যানাডায় এত সর্দারজী আছে যে ওর দাদা বা শালা না থাকলেও কেউ অবিশ্বাস করতে পারবে না। জামা-কাপড়ের ব্যাপারে আমার এসব চালিয়াতি ভাল লাগে না। আমি আর তর্ক না করে গঙ্গার কথা মত প্যাণ্ট-বুশ সার্ট বদলে আসি।

আমাকে দেখেই গঙ্গা বললো, একবার ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দেখে এসো কি সুন্দর লাগছে।

তোমার পাশে না দাঁড়িয়েই আমাকে দেখতে ভাল লাগছে?

এসব বাজে কথা বলতে সময় নষ্ট হচ্ছে না?

এর পর খাওয়া-দাওয়া। তারপরই আমি বেরিয়ে পড়ি। রোজ বেরুবার সময় বলি, জীবন-সংগ্রামে চললাম।

গঙ্গা হাসতে হাসতে বলে, বল ফাঁকি দিতে যাচ্ছি, আড্ডা দিতে যাচ্ছি।

রাস্তায় বেরিয়েও একবার পিছন ফিরে গঙ্গার দিকে তাকাই। না তাকিয়ে পারি না। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে ওকে দেখতে গিয়ে পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে মিণ্টো রোডের পূজা প্যাণ্ডেলে প্রথম আলাপের কথা। আমি গোবিন্দকাকুর সঙ্গে কথা বলছিলাম। গঙ্গাকে পাশ দিয়ে যেতে দেখেই গোবিন্দকাকু ডাকলেন, কিরে গঙ্গা কেমন আছিস?

ভাল।

দাদা-বৌদি এসেছেন?

না। আমি ক'জন বন্ধুর সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়েছি।

কাকিমার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

কাকিমাই তো আমাদের প্রসাদ দিলেন।

গোবিন্দকাকু আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই গঙ্গাকে চিনিস?

আমি একবার গঙ্গাকে দেখলাম, গঙ্গাও একবার আমাকে দেখল। তারপর আমি বললাম, না।

টিমারপুরের মেসে যখন আমি থাকতাম তখন ওর বাবার নতুন বিয়ে হয়েছে। মেসের রান্না ভাল হতো না। তাই ছু-পাঁচ দিন পর-পরই ওর মার হাতের রান্না খেয়ে মুখ বদলে আসতাম।

আমি হঠাৎ বলে ফেললাম, আমিও তো ভোলা ঘোষের মেসে

খেয়ে খেয়ে টায়ার্ড হয়ে গেছি। তাহলে কী আমিও মুখ বদলাতে যেতে পারি।

গোবিন্দকাকু বললেন, একদিন ঢিপ করে প্রণাম করে কাকীমা বলে ডাকিস তাহলেই বৌদি কাত। আমরা কী বৌদিকে কম এক্সপ্লয়েট করেছি।

আমি হাসি। চোরের মত একবার তাকিয়ে দেখলাম গঙ্গাও হাসছে।

গোবিন্দকাকু বললেন, হাসছিস কেন সোমনাথ? সত্যি বলছি গঙ্গার বাবা-মা পরের জন্য যা করতে পারেন তা তুই কল্পনা করতে পারবি না।

মাস খানেক পরে এক বাস স্টপে গঙ্গার সঙ্গে দেখা। গঙ্গাই প্রথম কথা বললো, কেমন আছেন?

ভাল। আপনি?

ভাল।

আপনার বাবা-মা?

ভাল। গোবিন্দকাকু যে একদিন আপনাকে যেতে বলেছিলেন।

কোথায়?

আমাদের বাড়ি।

যে অধিকার গোবিন্দকাকুর আছে সে অধিকার তো আমার থাকতে পারে না।

একবার এসেই না হয় পরীক্ষা করে দেখবেন।

আমার বাস এসে যেতেই উঠে পড়লাম। আর কথা হলো না কিন্তু বাসে উঠেই মনে হলো আরো কিছুক্ষণ বাস স্টপে দাঁড়িয়ে গল্প করলেই ভাল করতাম। আমি মেসে থাকি। নিঃসঙ্গতার একটা জ্বালা মাঝে মাঝেই ভোগ করি। গঙ্গার সঙ্গে দেখা হবার পর সে জ্বালাটা আরো বাড়ল। দিনে, রাত্রে একলা থাকলেই শুধু গঙ্গার কথা ভাবতে শুরু করলাম। একটু দেখা পাবার জন্য মনে মনে ছটফট করলেও কাউকে বলতে পারতাম না।

গঙ্গা এমন কিছু রূপসী সুন্দরী নয় কিন্তু ওর এমন একটা লাবণ্য আছে যা মন ভরিয়ে দেয়। তখনও দিয়েছিল। রূপ-যৌবনের মোহ থাকে কিন্তু লাবণ্য প্রশান্ত পরিপূর্ণতায় প্রকাশ। যার রূপ আছে লাবণ্য নেই, যৌবন আছে শ্রী নেই—সে নারী হ'তে পারে, স্ত্রী হতে পারে কিন্তু জীবন-সঙ্গিনী হ'তে পারে না। আমি বি-এ এম-এ পাশ না করলেও গল্প-উপন্যাস অনেক পড়েছি। তাই আমার মনে হয় গঙ্গার মত রাজলক্ষ্মীও বোধহয় লাবণ্যময়ী ছিল। তাই শ্রীকান্ত বার বার চলে গিয়েও ফিরে এসেছে। রূপযৌবনকে উপেক্ষা করা যায় কিন্তু লাবণ্য? অসম্ভব। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মত লাবণ্য দূরে থাকতে দেয় না। কাছে টেনে নেবেই। আমি এখন কখনও কখনও একথা গঙ্গাকে বললেই ও বলে, তুমি কি নিজেকে শ্রীকান্ত ভাব?

ছোটবেলায় আমাদের আশেপাশের বাড়ির অনেক ছেলেমেয়ের সঙ্গেই খেলাধূলা করেছি। লুডো, ক্যারাম বা লুকোচুরি। সবার চাইতে যাত্নকাকার মেয়ে সতী আর নিতুকাকার মেয়ে বনানীর সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। সতীর সঙ্গে লুডো না খেললে আমার পেটের ভাত হজম হ'তো না। পড়াশুনার চাপ না থাকলে অথবা পরীক্ষার পর রাত্তিরে খেয়েদেয়ে আবার চলে যেতাম যাত্নকাকার বাড়ি। আমি আর সতী লুডো নিয়ে বসে যেতাম। মাঝে মাঝে যাত্নকাকাও আমাদের সঙ্গে খেলতে বসতেন। মা ডাকতে এসে থমকে দাঁড়াতেন। কাকিমাকে বলতেন, তুমি এবার তোমার স্বামীকে একটা হাফ্‌প্যাণ্ট পরিয়ে আবার স্কুলে পাঠাতে শুরু কর। মার কথা শুনে আমি আর সতী আনন্দে, মজায় হাততালি দিয়ে উঠতাম। কাকিমা যাত্নকাকাকে বলতেন, কিগো, সেজদির কথা কানে যাচ্ছে না?

যাত্নকাকা মুখ না তুলে খেলতে খেলতেই জবাব দিতেন, শুনেছি।

তবে যে চুপ করে আছো?

আমার হাফ্‌প্যাণ্ট তো তৈরী কিন্তু সেজবৌদির ফ্রক না আসা পর্যন্ত কিভাবে স্কুলে যাবো?

যাত্নকাকার কথায় আমরা দুজনে হো হো করে হেসে উঠতাম।

নিতুকাকা দিল্লীর নাম করা ক্যারাম খেলোয়াড় ছিলেন। অনেক কম্পিটিশনে কাপ-মেডেল পেয়েছিলেন। ওদের বসবার ঘরে সেগুলো সাজানো ছিল। পরবর্তীকালে কম্পিটিশনে না খেললেও বাড়িতে ক্যারাম খেলা চলত রোজ সকাল-সন্ধ্যায়। নিতুকাকার বন্ধুবান্ধব ছাড়াও পাড়ার অনেকেই এই ক্যারামের আড্ডায় আসতেন। আমি আর বনানী অনেক সময়ই নিতুকাকাদের খেলা দেখতাম। যখন খেলা হতো না কাপ-মেডেল দেখতাম। নিতুকাকার ছবিগুলো দেখতাম। তারপর একবার বনানীর জন্মদিনে নিতুকাকা ওকে একটা ছোট ক্যারাম বোর্ড দিতেই আমরাও খেলতে শুরু করলাম। লুডোর চাইতে ক্যারাম খেলাই আমার কাছে বেশী সম্মানজনক মনে হতো কিন্তু সতীর জন্য খুব বেশী খেলতে পারতাম না। ও বলতো, তুই হ্যাংলার মত ওদের বাড়িতে ক্যারাম খেলতে যাস কেন রে?

বলতে পারতাম না, তোর এখানে কি হ্যাংলামী করে লুডো খেলতে আসি। বলতে পারতাম না, তোর মত বনানীও তো আমার বন্ধু। ওর সঙ্গে ক্যারাম খেললে হ্যাংলামীর কি আছে? শুধু বলতাম, ও বার বার করে ডাকে বলে যাই।

সতী ঠোঁট উল্টে বলতো, ভারী তো একটা ক্যারাম কিনেছে! ওর সঙ্গে কথা বলতেও আমার ঘেন্না হয়।

সতী যাই বলুক না কেন আমি সুযোগ পেলেই নিতুকাকার বাড়িতে বনানীর সঙ্গে ক্যারাম খেলতাম। বনানী বলতো, তুই কচি বাচ্চাদের মত এখনও লুডো খেলিস কেন রে? আমার তো লুডো খেলতে দারুণ লজ্জা করে।

এমনি খেলি।

না, না, আর খেলতে হবে না। তাছাড়া তুই খেলবি বলেই তো বাবা আমাকে কত টাকা দিয়ে ক্যারাম কিনে দিলেন।

ছোটবেলার এসব কথা মনে পড়লে হাসি পায়। মাঠের চারপাশে প্রায় পাশাপাশি আমাদের বাড়ি ছিল। এ রকম রেশারেশি থাকা সত্ত্বেও আমাদের তিনজনের মধ্যে যথেষ্ট ভাব ছিল। অনেক দিন

পর্যন্ত আমাদের ভাব ছিল। তারপর হঠাৎ একদিন বনানী শাড়ী পরতে শুরু করতেই আমি নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। আমি তখনও হাফপ্যান্ট পরি। বনানী কোমরে শাড়ীর আঁচল জড়িয়ে এলেও আমি সহজ হতে পারতাম না। লজ্জা করতো। মনে হতো ও বড় হয়ে গেছে। সতি্য ও মাঝে মাঝে মা কাকিমাদের সঙ্গে কালীবাড়ি যেতো। আমি দূর থেকে দেখে আরো দূরে নিজেকে টেনে নিতাম। তারপর একদিন সতীও শাড়ী ধরল। শেষ হলো মেয়েদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের পালা। এরপর একদিন আমিও বড় হলাম। আমারও দাড়ি-গোঁফ উঠল। আমি আর কিছুতেই কোন মেয়ের সঙ্গে সহজে মিশতে পারলাম না। কখনও লজ্জায়, কখনও দ্বিধায় আমি পিছিয়ে আসতাম।

গঙ্গার সঙ্গে সামান্য পরিচয় হলেও আমি নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পারছিলাম না। পারছিলাম না নিজেকে নিজের মধ্যে বন্দী রাখতে। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার পাতায় পাতায় কত দেবদেবীর পূজার তিথি লেখা থাকে কিন্তু শুধু শরতেই আমরা দেবীর আগমনীর আমেজে ডুবে যাই। শীতের শেষে বসন্তে ঐ একই দেবী আবার এলেও সেই আমেজ, সেই আনন্দের ইসারা আর মনকে ভরিয়ে তুলতে পারে না। ভোলা ঘোষের মেসে থাকি, উদ্যোগ ভবনে চাকরি করি আর ঘুরে বেড়াই সারা দিল্লী। কত মেয়ে দেখি। পারিবারিক সূত্রে পরিচয় আরো কত মেয়ে কিন্তু ঠিক ঐ এক প্রত্যাশা নিয়ে আর কাউকে খুঁজে বেড়াতাম না। অনেক দিন পরে পুসার মোড়ে যখন একদিন সত্যি সত্যিই ওর সঙ্গে দেখা হলো তখন আর মনের কথাগুলো চেপে রাখতে পারলাম না।

হাসতে হাসতে বললাম, আপনি এখানে আর আমি আপনাকে সারা দিল্লী খুঁজে বেড়াচ্ছি।

গঙ্গা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কেন ?

কেন আবার ? শুধু মনে হচ্ছিল দেখা হলে ভাল হতো।

ও! তাই বলুন। আমি ভাবলাম বুঝি কোন জরুরী কারণে....

একজন সামান্য কেরানীর ভাল লাগাটার বুঝি কোন মূল্য নেই ?

নিশ্চয়ই আছে কিন্তু আমি তো আগে জানতাম না।

এখন তো জানলেন।

আপনি জানালে সবই জানতে পারি।

সবই মানে ?

গঙ্গা মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললো, মানে সবই।

দুজনেই একসঙ্গে হাসলাম।

হাসি থামলেই গঙ্গা বললো, ভাল কথা, বাবা বলছিলেন বছর তিরিশেক আগে নাকি আপনার বাবার সঙ্গে ওর খুব পরিচয় ছিল।

হঠাৎ আমার বাবার কথা উঠল ?

গোবিন্দকাকু এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। ওর সঙ্গে কথায় কথায় আপনার কথা উঠল···

আমার কথা ?

হ্যাঁ, আপনার কথা।

কেন ?

কেন জানি না। তবে কথায় কথায় গোবিন্দবাবু আপনার কথা বলছিলেন।

বললেন তো আমি একটা অপদার্থ কেরানী।

তা বলবেন কেন ? তবে·······

গঙ্গা থামল। একবার আমার দিকে তাকাল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তবে বলেই থামলে যে ?

তবে বললেন যে নিজের ব্যাপারে আপনি খুব উদাসীন।

উদাসীন মানে ?

মানে বেশী পয়সা বা জীবনে উন্নতি করার মত প্রচেষ্টা আপনার নেই।

তা ঠিক।

এরপর যখন গঙ্গার সঙ্গে আমার দেখা হলো তখন সোজাসুজি

বললাম, বাপ-ঠাকুর্দা ঘুষ খেয়ে অনেক টাকা রোজগার করেছেন বলে বেশী টাকা রোজগার করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। তাছাড়া সবাই কি জীবনে বড় হতে পারে?

তা ঠিক।

যারা বড় হতে চায় তারা বড় হোক, সুখী হোক। আমি সাধারণ কেরানী হয়েই সুখী হতে চাই।

আস্তে আস্তে আমাদের হৃদ্যতা হবার পর গঙ্গা বলেছিল, এই পৃথিবীতে সবাই বড হতে চায়। যা হয়েছে তার চাইতে উপরে উঠতে চায় কিন্তু অধিকাংশই তা পারে না বলেই মানুষ এত দুঃখী, ঘরে ঘরে এত অশান্তি।

তাই তো শুনি।

আপনার আর কিছু না হোক এ দুঃখ, এ অশান্তির জ্বালা আপনি ভোগ করবেন না।

সেটা কি খারাপ?

খারাপ হবে কেন? বরং····। থাক: আপনার সামনে আপনার প্রশংসা না করাই ভাল।

আমার অসাক্ষাতে আমার প্রশংসা করেন নাকি?

না। নিন্দা করি।

এসব দিন আর নেই। পিছনে ফেলে এসেছি বেশ কয়েক বছর আগে। সে মন, সে চোখের দৃষ্টিও নেই। পৃথিবী এখন আর অত সবুজ নয়। জীবন শুধু মধুময় নয়। এখন জেনেছি সব মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না, থাকতে পারে না। বোধ হয় সম্ভবও নয়। এক কালে সব পরিচিতদেরই বন্ধু মনে হতো; এখন বন্ধুদের শুধু পরিচিতই মনে হয়। তা হোক। জীবনের মাধুর্য আমি হারাই নি। গঙ্গা হারাতে দেয় নি।

অফিস থেকে ফিরতে আমার দেরী হলে গঙ্গা পথের দিকে তাকিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। আমি সামান্য কেরানী। সারা দিনের অনেক গ্লানি, অনেক ব্যর্থতা আর অপমানের বোঝা নিয়ে বাড়ি ফিরি

কিন্তু দূর থেকে গঙ্গাকে দেখেই সব ভুলে যাই। ভুলে যাই আমি সামান্য, আমি সমাজের উপেক্ষিত, উদ্যোগ ভবনের নোংরা ঘর আর ছেঁড়া ফাইলের স্তূপের কথাও ভুলে যাই। মনে পড়ে না আমি গোলামী করি, সেকসন অফিসারের স্তাবকতা করি, দূর থেকে ডেপুটি সেক্রেটারীকে দেখলে আমার হৃৎপিণ্ডের ওঠা-নামা বন্ধ হয়ে যায়। গঙ্গাকে দেখলেই মনে হয় আমি সম্রাট। বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে গঙ্গাকে বলি, রাজলক্ষ্মীও বোধহয় কলকাতার জাহাজ ঘাটে শ্রীকান্তর জন্য এমনি অপেক্ষা করতো, তাই না?

গঙ্গা কোন কথা বলে না। শুধু হাসে।

আমি জিজ্ঞাসা করি, কি হলো, হাসছ কেন?

তোমার কথা শুনে।

আমার কথা শুনে?

ও শুধু মাথা নাড়ল।

আমি আবার বলি, হাসির মত কি বললাম?

তুমি সব সময় আমাকে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে তুলনা কর কেন?

এই জন্য তুমি হাসছিলে?

হু।

এতে হাসির কি আছে?

গঙ্গা সোজা উত্তর না দিয়ে জানতে চাইল, তুমি নিজেকেই বা শ্রীকান্ত মনে কর কেন?

তোমার কাছ থেকে রাজলক্ষ্মীর মত ভালবাসা পাবার লোভে।

কিন্তু…

গঙ্গা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। আমার দিকে তাকিয়ে একটু যেন করুণ হাসি হাসল।

কিন্তু বলে থামলে কেন?

শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর মত সর্বনাশা ভালবাসা আমাদের চাই না।

কেন?

এত ভালবেসেও ওরা কি সুখী হয়েছিল?

আমি আর কথা বলি না। চুপ করে ওর হাত ধরে ঘরে চলে যাই।

বাসের জন্য লাইন দিই, অপেক্ষা করি বাসে উঠে অফিসের সামনে নামি। আশেপাশে জানাশুনা কাউকে না পেলে মনে মনে গঙ্গার কথাই ভাবি। না ভেবে পারি না। জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরাজয়বরণ করেছি। যে কোন কারণেই হোক বাবার রোজগার বেশ ভালই ছিল। ইচ্ছা করলে বা চেষ্টা করলে অনেক দূর লেখাপড়া করতে পারতাম। আমার সঙ্গে যারা রাইসিনা স্কুলে পড়তো তাদের অনেকেই যথেষ্ট উন্নতি করেছে। অশোক তো ঠিক আমারই পাশে বসত। অত্যন্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। আমার চাইতে খুব বেশী বুদ্ধিমানও ছিল না। তবু পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে বেশ ভালভাবেই এম·এ পাশ করল তারপর আই-এ-এস পরীক্ষা দিল, পাশও করল। এখন অশোক ফুড মিনিস্ট্রিতে ডেপুটি সেক্রেটারী। এরপর হয়ত জয়েণ্ট সেক্রেটারী হয়ে আমাদেরই উদ্যোগ ভবনে চলে আসবে? তখন? আমি তো দূরের কথা আমাদের আণ্ডার সেক্রেটারীকে ডেকে পাঠালে তার প্যাণ্টুলুন খারাপ হয়ে যাবে।

প্রদীপের কাছেই আমি প্রথম খবর পাই অশোক আই-এ এস হয়েছে। খুব খুশী হয়েছিলাম। আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেললাম বলে কিছু করতে পারলাম না। আই-এ-এস হয়ত আমি হতাম না কিন্তু এভাবে সরকারের লোয়ার ডিভিশন কেরানী হয়েও জীবন শুরু করতে হতো না। প্রদীপের কাছে খবরটা শোনার পর ইচ্ছা করছিল অভিনন্দন জানিয়ে আসি কিন্তু কোন উৎসাহ প্রকাশ করলাম না। ভাবলাম, এতকাল পরে চিনতে পারবে কি? যদিও বা চিনতে পারে তাহলেও কি বন্ধুর মত ব্যবহার করবে? যদি ভাবে আমি কিছু কাজ হাসিল করতে গেছি? অথবা আরো কিছু। অন্য কিছু। প্রদীপকে শুধু বললাম, আমরা ওকে নিয়ে গর্ব করলেও ও কি আমাদের কথা মনে রেখেছে?

প্রদীপ পান চিবুতে চিবুতে বললো, কি বলিস রে? পরশুদিনও আমরা তুজনে লাইন দিয়ে ওডিয়নে সিনেমা দেখলাম।

তোর সঙ্গে যোগাযোগ আছে বলে হয়ত ডাঁট মারল না, কিন্তু আমার সঙ্গে তো বহুকাল দেখাশুনা নেই। আমার কথা হয়ত ভুলেই গেছে।

ভুলে যাবে কেন? পরশুদিনই ও বলছিল সব পুরানো বন্ধুদের একদিন চা খাওয়াবে।

তবুও দেখা করলাম না। শেষে একদিন অনাদি জোর করে আমাকে নিয়ে গেল। দেখলাম আগের মত রোগা লিকলিকে নেই, একটু মোটা হয়েছে। চশমা নিয়েছে। হঠাৎ রাস্তায় দেখা হলে হয়ত চিনতেই পারতাম না। কিন্তু সে যাই হোক আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করল। খগেন মাস্টারের বেত মারা নিয়ে খুব হাসাহাসি করল। শেষে চলে আসার সময় বললো, ট্রেনিং শেষ করে দিল্লী আসার পর একটা রেগুলার আড্ডার ব্যবস্থা করতে হবে, কি বল?

বছর খানেক পরে ওর বিয়ের কার্ড আর একটা চিঠি পেয়েছিলাম। প্রদীপদের সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম। সেদিনও বন্ধুসুলভ ব্যবহারই করেছিল। এর পর আবার ছাড়াছাড়ি। শুধু জানতাম অশোক ইরিগেশন মিনিস্ট্রির আণ্ডার সেক্রেটারী কিন্তু দেখাশুনা হতো না। একদিন আমি আর গঙ্গা কিছু কেনাকাটা করার জন্য কনটপ্লেস গেছি। এ দোকান সে দোকান ঘুরছি। রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। চিনেবাদাম চিবুচ্ছি। হঠাৎ একটা গাড়ি এসে এমনভাবে আমার পাশে ব্রেক করল যে চমকে গেলাম। আমি কিছু বলার আগেই অশোক গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বের করে আমাকে শুধু জিজ্ঞাসা করল, বউ না বান্ধবী?

আমি বললাম, বান্ধবী নিয়ে এভাবে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবার সাহস কোথায় পাব?

অশোক সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করে গঙ্গাকে নমস্কার করে বললো, আমি ওর বাল্যবন্ধু অশোক।

গঙ্গাও হাত জোড় করে নমস্কার করলো। বললো, আপনি তো এদের গর্ব।

ওসব কথা ছাড়ুন। বাবা-মা বেনারস, বউ বাপের বাড়ি। একা একা ভালো লাগছে না বলে সিনেমায় যাচ্ছি। যাবেন তো চলুন।

গঙ্গার একটু দ্বিধা ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত অশোকের অনুরোধে তিনজন মিলে সিনেমায় গেলাম। চা-কফি খেলাম। ওর গাড়ি চড়েই বাড়ি ফিরলাম।

আরো অনেক বন্ধুবান্ধবের কথা মনে হয়। সন্দীপ ডাক্তার হয়েছে, বলাই বি এস-সি পাশ করে ক্যানাডায় চলে গিয়ে খুব উন্নতি করেছে, নরেশ এয়ার ইণ্ডিয়ার এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেলস ম্যানেজার হয়েছে, অজিত সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশনের একাউন্টস ডিপার্টমেণ্টে অফিসার। প্রদীপ ইন্সিওরেন্সের কাজ করেই বাড়ি-গাড়ি করেছে। অনেক বন্ধু-বান্ধব কেরানীও হয়েছে। ভারত সরকারের বহু অফিসেই আমার অনেক বন্ধু আমারই মত কেরানী কিন্তু তারা সবাই জীবনে উন্নতির চেষ্টা করেছিল। পারে নি নানা কারণে। পারিবারিক, অর্থ নৈতিক ও আরো কত কারণে। আর আমি? আমি চেষ্টাই করি নি। জীবনে আমি কিছুই হতে চাই নি। শুধু রোজগার করে দু'মুঠো অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলাম—আর কিছু নয়। শুধু দু'মুঠো অন্নই কি জীবনের সবকিছু?

বাসের জানলার ধারে বসে বসে কত কি মনে হয়। যত বেশী ভাবি তত বেশী মন খারাপ হয়। কেমন একটা বেসুরো করুণ সুর সব সময় মনের মধ্যে শুনতে পাই। শুধু গঙ্গাকে কাছে পেলে মনে হয় আমি পরাজিত সৈনিক না, বিশ্ব নিন্দিত কেরানী না, আমি উপেক্ষিত অনাদৃত সোমনাথ সরকার না—মনে হয় আমি সম্রাট, আমি নায়ক। এখানে উপেক্ষা নেই, অনাদর নেই দীর্ঘনিশ্বাস নেই। গঙ্গার স্কুল বন্ধ থাকলেই আমার অফিস যেতে ইচ্ছা করে না। মাঝে মাঝে সত্যি সত্যিই ডুব দিই। সারা সকাল শুধু চা খাই আর গল্প করি। তারপর যখন গঙ্গার হুঁস হয় তখন বলে, দশটা বাজে।

তাতে কি হলো ?

এখনও আমরা জলখাবার খেলাম না ?

না।

কখন জলখাবার খাব ?

এগারটা —বারোটা—একটায়।

রান্না করব কখন ?

তারপর।

সে রান্না খাব কখন ?

দুটো—তিনটে—চারটেয়।

গঙ্গা আমাকে এক ধাক্কা দিয়ে বলে, তুমি অফিস যাও তো। বাড়ীতে বসে বসে আমার কাজকর্মের বারোটা বাজাতে হবে না।

আমি কি তোমাকে কাজ করতে দেবার জন্য বাড়িতে থাকলাম ?

কিজন্য তুমি অফিস গেলে না শুনি।

আমি ওর কানে কানে ফিস ফিস করে আমার প্রাণের ইচ্ছা মনের বাসনা জানাতেই ও ছিটকে দূরে সরে গিয়ে হাসতে হাসতে দুটো বুড়ো আঙুল দেখিয়েই রান্নাঘরে চলে গেল।

গঙ্গার স্কুলের মত অত ছুটি সরকারী অফিসে নেই। তবে বছরে বারো দিন ক্যাজুয়াল লিভ, মাসে মাসে চারটে রবিবার ও একটা সেকেণ্ড স্যাটারডে, এক মাস আর্ন লিভ ছাড়া গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র, জাতির জনক ও হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান-মুসলমান দেবদেবী-মহাপুরুষদের কৃপায় দুপুরবেলায় গঙ্গার কাছে কাটাবার সুযোগ ভালই পাই। আমাদের দেবেনদা ছুটি পেলেই কোন মতে দু'মুঠো ডাল-ভাত খেয়েই কুমুদ সান্যালের বাড়ির তাসের আড্ডায় চলে যান। সারা দুপুর পার হয়ে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যো আসে কিন্তু তাসের যুদ্ধ থামে না। রণদেববাবু ছুটি পেলেই সাইকেল মেরামত

করবেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। তারপর বেলা গড়িয়ে যাবার পর বৌকে ডেকে বলবেন, হ্যাগো, সাইকেলটাকে কেমন দেখাচ্ছে বলতো !

ভাল।

খুব পরিষ্কার হয় নি ?

হয়েছে।

এখন সাইকেল চালিয়ে যা আরাম হবে না, তা কি বলব। লোকে যে কিভাবে নোংরা ভাঙা সাইকেল নিয়ে অফিস যায়, তা আমি ভেবে পাই না।

এত কাল একসঙ্গে ঘর করার পর রণদেববাবুর স্ত্রীও স্বামীর জীবন দর্শনের সমর্থক হয়েছেন। বলেন, নোংরা সাইকেল আমিও দেখতে পারি না।

আমাদের লাঞ্চ ক্লাবে পৃথিবীর সব কিছু নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হয়। রণদেববাবুর সাইকেল-প্রীতি নিয়েও আলোচনা হয়।

কেষ্ট ঘোষ চারমিনার টানতে টানতে বললেন, রণদেব যদি সাইকেলের বদলে বউটার যত্ন নিত তাহলে সংসারের অনেক কাজ হতো।

কেশব দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, ওর স্ত্রীর কি হয়েছে ?

ভদ্রমহিলার অনেক রকম অসুখ আছে। বার দুই অপারেশনও হয়েছে।...

তাই নাকি ?

এর উপর ভদ্রমহিলাকে সংসারের যাবতীয় কাজ নিজেকে করতে হয়। এইত গত রবিবারই বাজারে দেখি ভদ্রমহিলা গম ভাঙিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

কি আশ্চর্য !

ছুটির দিনে এক এক কেরানীবাবুর এক এক রকম বাতিক হয়। ইন্দুদার ঘুম, শিবনাথদার আড্ডা, কেষ্ট ঘোষের বাজার যাওয়া। জ্যোতি ছুটি পেলেই শুধু গল্পের বঁই মুখে দিয়ে বসে থাকবে। তুষার,

সুনীল, বড়ুয়া ছুটির দিনে ক্লাব নিয়েই পাগল। আরো কত রকমের বাতিক থাকে আমাদের মত কেরানীবাবুদের। আমারও বাতিক আছে। ছুটি পেলেই গঙ্গার পাশে-পাশে কাছাকাছি থাকতে আমার খুব ভাল লাগে। এমন কি গঙ্গা যখন রান্না করে তখনও আমি ওর কাছেই দাঁড়িয়ে থাকি। কখনও কখনও ওকে একটু-আধটু সাহায্য করি। ছুটির দিনে আমি যে গঙ্গাকে ছেড়ে কোথাও যাই না, সে কথা সবাই জানেন। ইন্দুদা বলেন, মাঝে মাঝে ভাবি তোমার ওখানে একটু ঘুরে আসি কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর যাই না।

এলেই পারেন। বেশ একটু আড্ডা দেওয়া যায়।

গেলে তো বিপদে পড়ব।

কেন?

ইন্দুদা একটু হাসতে হাসতে বলেন, বৌমার সঙ্গে তোমার যা ভাব! গেলেই তো শুটিং বন্ধ হয়ে যাবে।

আগের মত এখন যৌবনের উন্মাদনা না থাকলেও আমি গঙ্গাকে দূরে রাখতে পারি না। শুধু নিজেকে ছাড়া আর কিছুই তো ওকে দিতে পারি নি। আমি ছাড়া ওর কে আছে? একটা সন্তানও যদি হতো তাহলেও গঙ্গা তার সঙ্গে সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোল আবৃত্তি করে ছুটির দিনগুলো কাটাতে পারতো। তা হলো না। হবে না। জানি না কার ত্রুটি। আমার না ওর। মাঝে মাঝে ভাবি ডাক্তারের কাছে যাই। কিন্তু না, পিছিয়ে আসি। ভয় হয়। দ্বিধা হয়। সঙ্কোচ হয়। যদি আমার ত্রুটির জন্য ওকে সন্তান সুখ দিতে পারলাম না, তাহলে আমাকে ভালবাসার জন্য গঙ্গা অনুশোচনা করবে। দুঃখ পাবে। হয়ত ভাববে....

কত কি ভাবতে পারে। হয়ত ডাক্তারের কথায় আমারও নানা রকম ভাবনা মনে আসতে পারে। হয়ত গঙ্গা নিজেকে অপরাধী ভাবতে পারে। কত কি হতে পারে। তার চাইতে যেমন আছি, তেমনই থাকা ভাল। ডাক্তারের কাছে যাবার কথা মনেই আনি না। গঙ্গাও কখনও কিছু বলে না। এ ব্যর্থতার বেদনা মনের মধ্যে

থাকলেও মোটামুটি হাসি মুখেই আমরা দিনগুলো কাটিয়ে দিই। যখন ওকে কাছে পাই না, যখন একলা থাকি, তখনও গঙ্গার কথাই ভাবি। না ভেবে পারি না। কিছুতেই পারি না।

বাসে জানাশুনা কেউ পাশে বসলে এত সব চিন্তার সুযোগ হয় না। গল্পগুজব করতে হয়। দিল্লীর সরকারী আমলাদের গল্পগুজব মানেই অফিসের আলোচনা। আলোচনা মানেই সমালোচনা। নিজের সমালোচনা কখনই নয়, শুধু পরের সমালোচনা। অর্থাৎ স্রেফ নিন্দা।

পশুপতি ব্যানার্জী অনার্স নিয়ে ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে বি-এ পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ পড়েন। পাশ করেন। জলপাইগুড়ি আনন্দমোহন কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনাও করেছিলেন। তারপর রাস্তা হারিয়ে এ গলি-সে গলি ঘুরতে ঘুরতে ভারত সরকারের আমলা হন। এসব কথা ইতিহাস, একবার নয়, দুবার নয়, হাজার-হাজার বার ওর কাছে শুনেছি। শুনেছি ওর পরিবারের ইতিহাস। মাঝে মাঝেই বাসে উঠে পশুপতিবাবুর সঙ্গে দেখা হয়। দেখা হলেই ডাকবেন, এসো সোমনাথ, এসো।

একে বয়সে বড়, তারপর এম এ পাশ। আমাদের মত অশিক্ষিত আমলা ভাইদের উপর দাদাগিরি করার অধিকার ওর নিশ্চয়ই আছে। তাই ওর পাশে বসতে বসতেই জিজ্ঞাসা করি, বলুন দাদা কি খবর?

পশুপতিবাবু একটু হেসে বললেন, একবার খবরের কাগজের রিপোর্টাররা বার্ণাড শ'কে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন আছেন। তাতে বার্ণাড শ' কি জবাব দিয়েছিলেন জান?

আমি বার্ণাড শ'র নাম শুনেছি। জানি তিনি মহা পণ্ডিত ছিলেন। তিন মূর্তিভবনে বার্ণাড শ'র সঙ্গে নেহেরুর ছবি দেখেছি কিন্তু তার বেশী কিছু জানি না। সুতরাং দ্বিধাহীন চিত্তে পশুপতিবাবুর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম, না দাদা, জানি না।

শ বলেছিলেন, এ্যাট দিস এজ আইদার ওয়ান ইজ ওয়েল অর ডেড।....

আমি হাসলাম।

পশুপতিবাবু বললেন, যখন সরকারী খাতায় নাম লিখিয়েছি তখন ভাল থাকার প্রশ্নই ওঠে না। ধরতে গেলে মরেই বেঁচে আছি।

আমি কোন মন্তব্য না করলেও উনি থামেন না। বললেন, কম-বেশী রোজগারের জন্য আমার দুঃখ নেই কিন্তু এই যে সারাটা দিন একদল আনকালচার্ড লোকের সঙ্গে কাটাতে হবে সেটাই সব চাইতে বড় দুঃখ।

আর চুপ করে থাকা যায় না। বাধ্য হয়ে দাদাকে সমর্থন জানাতে হয়। বলি. কেরানীগিরি করতে তো বিদ্যে-বুদ্ধির দরকার হয় না।

আরে দুর! তাই বলে যারা সাত্রে-র নাম শোনে নি—এমন লোকেদের আণ্ডারে কি কাজ করা যায়?

মনে মনে বলি, করেন কেন? কে আপনাকে হাতে-পায়ে ধরে সরকারী চাকরি করতে বলেছিল? পশুপতি বাঁড়ুজ্যে ভারত সরকারের আমলা না হলে কী সরকার লাটে উঠত? এবার বললাম, আপনার এডুকেশন্যাল লাইনেই থাকা উচিত ছিল।

তখন তো ভাবি নি সরকারী অফিসে বুনো জলের বন্যা বইবে। পশুপতিবাবু একটু থেমেই বললেন, কি বলব সোমনাথ, আজকাল যারা আই-এ-এস পাশ করে আসছে তারাও এমন পুওর স্ট্যাণ্ডার্ডের যে ভাবতেই অবাক লাগে।

রুদ্র যদি পাশে বসে তাহলে সারাক্ষণ শুধু ওভার-টাইমের গল্প করবে। রুদ্র আমাবই সমবয়সী। আগে উদ্যোগ ভবনেই ছিল। এখন স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনে আছে। ওর হাব-ভাব চাল-চলন পোশাক-আসাক দেখলেই বুঝা যায় বেশ টু-পাইস আমদানী হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করি খবর ভাল?

খুব ভাল নয় তবে ডিসেম্বর-জানুয়ারী থেকে ভালই থাকব।

কেন?

মার্চের মধ্যে এ বছরের সব একসপোর্ট-ইমপোর্টের কাজ শেষ করতে হবে তো। তখন রাত দশটার আগে বাড়ি ফিরতে পারব না।

এখন ক'টায় ফিরছ ?

আটটা অবধি অফিসে থাকার কথা তবে সাতটার মধ্যেই কাট মারি।

রোজই ?

হ্যাঁ, রোজই।

কেন ?

আমরা যে উৎপল দত্তের ফেরারী ফৌজ করছি। তাই রিহার্সাল দিতে আসি।

ওদিকে মিটার ডাউন করে যখন এদিকে রিহার্সাল চলছে, তখন বলতে হবে বেশ ভালই আছো।

যতদিন আমাদের বোসদা মার্কেটিং ম্যানেজার আছেন ততদিন ভালই থাকব।

কোন বোসদা ?

চিনলেন না ? আগে আমাদের টেকসটাইল সেক্‌সনে কাজ করতেন।

চিতু বোস ?

রুদ্র এক গাল হাসি হেসে বললো, হাঁ।

হা ভগবান। ও তো আমাদের এখানে ইউ-ডি-সি ছিল। সে এখন মার্কেটিং ম্যানেজার ?

বোসদা এখানে এ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে ঢুকে প্রমোশন পেতে পেতে এখন মার্কেটিং ম্যানেজার। মাঝে তিন বছর অস্ট্রেলিয়াতেও কাটিয়ে এলেন।

বল কী ?

এস-টি-সি'র প্রথম আমলে যারাই এভাবে এসেছিলেন তারা সবাই এখন বড় বড় অফিসার।....

তাই নাকি ?

আমি নিজেই তো এম-এম-টি-সিতে সেকসন অফিসার হবার চান্স পেয়েছিলাম, কিন্তু কলকাতা যেতে হবে বলে গেলাম না।

চিতু আমারই মতন মেড ইন রাইসিনা স্কুল। আমারই মত লোয়ার ডিভিশন কেরানী হয়ে উদ্যোগ ভবনে ঢুকেছিল। তারপর হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম চিতু নেই। এস-টি-সিতে চলে গেছে। ভাবলাম বিশ-পঁচিশ টাকা ডেপুটেশন এলাউন্সের লোভে চলে গেছে। গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদ যত বেশী মজবুত হয়েছে, স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনে চিতুর উন্নতিও তত বেশী হয়েছে। মনে মনে বললাম, চিতু তুমি সুখে থাক। তোমার মত একজন কৃতি পুরুষ যে ভারতীয় সমাজতন্ত্রের একটা স্তম্ভ সামলাচ্ছে তার জন্য প্রগতিশীল মেহনতী মানুষদের পক্ষ থেকে আমি অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাই। মনে মনে বললেও নিশ্চয়ই হাসছিলাম। রুদ্র জিজ্ঞাসা করল, হাসছ কেন?

বললাম, চিতুর মত ম্যার্কেটিং ম্যানেজার আছে বলেই বোধহয় এস-টি-সির এত সুনাম, তাই না?

রুদ্র বললো, সে যাই হোক বোসদা খুব পপুলার।

খুব ওভারটাইম দেয় বুঝি?

এ্যাট র‍্যানডম। যেদিন ইচ্ছে সেদিনই আমরা ওভারটাইম নিই।

সব অফিসারই কি এই রকম ওভারটাইম দেন?

কম-বেশী সবাই দেন! ওভারটাইম না দিলে যেটুকু কাজ হচ্ছে তাও হবে না।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমরা উদ্যোগ ভবনে এস-টি সির কি নামকরণ করছি জান!

কি?

স্টেট ট্যামপ্যারিং কর্পোরেশন!

রুদ্র হো হো হেসে উঠতেই দেখি উদ্যোগ ভবন এসে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। জনস্রোতের সঙ্গে অফিসে ঢুকতে ঢুকতে ভাবলাম কে বলে আমরা কেরানীরা বোকা? এই জনস্রোতের মধ্যেই যে আরো কত মার্কেটিং ম্যানেজার লুকিয়ে আছেন তা কি আপনারা জানেন?

শুধু আপনারা কেন, অনেক সময় আমরা এত বছর উদ্যোগ ভবনে কাটিয়েও বুঝতে পারি না অনেক কিছু। জানতে পারি না পরিচিত সহকর্মীদের চরিত্র। এই যে চিতু বোস! দেখলে মনে হবে নিছক গোবেচারী ভদ্রলোক। ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। যখন আমাদের এখানে আপার ডিভিসন ক্লার্ক ছিল তখন অফিস ছাড়া নবোদয় ক্লাবে থিয়েটার করত। তাও ছোটখাট নগণ্য কোন চরিত্রে। বড় বই হলে চিতু বোস সব সময় প্রম্পটার হতো কিন্তু এর বেশী কিছু আমি জানতাম না। রুদ্রের কাছে ওর কথা শোনার পর আস্তে আস্তে চিতু বোসের কাহিনী জানলাম।

অভিনয় না করলেও চিতু বোস নবোদয় ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হবার পরই মন্ত্রীপত্নীকে ক্লাবের সভানেত্রী করল। ভারত সরকারের শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রীর পত্নীকে ক্লাবের সভানেত্রী করার পরই চিতু বোসের অনুপ্রেরণায় ক্লাব নাট্য উৎসবের আয়োজন করল। অর্থের জন্য স্মারক পত্রিকা ছাপা হলো। চিঠির মাথায় সভানেত্রীর নাম ও ঠিকানা দেখেই প্রায় বিনা প্রচেষ্টায় চল্লিশ হাজার টাকার বিজ্ঞাপন এলো। নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করলেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি। চিতু বোসের সৌজন্যে ও উৎসাহে দিল্লীর জনজীবনে প্রায় অজ্ঞাত অপরিচিতা মন্ত্রীপত্নী পাদপ্রদীপের আলোয় ঝলমল করে উঠলেন। মন্ত্রীপত্নী খুশী, চিতু বোস কৃতার্থ, ধন্য।

ইন্দুদা বললেন, মিনিস্টারের বৌকে নিয়ে এরকম নাচানাচি করতে তুমি পারবে? যদি পারো তাহলে তুমিও স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের মার্কেটিং ম্যানেজার হবে।

কেষ্ট ঘোষ বললেন, শুধু চিতু বোস কেন, আরো কত শত শত চিতু বোস পয়দা হয়েছে এই উদ্যোগ ভবনে। সালুজা বলে একটা টাইপিস্ট টেক্সটাইল কমিশনারের অফিস থেকে বদলী হয়ে আমাদের ব্রাঞ্চে এলো। তারপর একে ওকে অনেক ধরাধরি করে জয়েণ্ট চীফ কণ্ট্রোলার অফ ইমপোর্টস এ্যাণ্ড এক্সপোর্টস এর অফিসে চলে গেল। যাবার সময় আমাদের বলে গেল নিছক ওভার টাইমের জন্য যাচ্ছে। কেউ বিশ্বাস করল, কেউ করল না।

ইন্দুদা বললেন, অত শুনতে কে চাইছে? টাইপিস্ট সালুজা এখন প্রেসিডেণ্ট না প্রাইম মিনিস্টার হয়েছে তাই বললেই ল্যাটা চুকে যায়।

তাই তো বলছি। একটু ধৈর্য ধরে শোন।

বল, বল।

বছর চার-পাঁচ ওখানে কাজ করার পরই একদিন হঠাৎ সালুজা চাকরি ছেড়ে দিল।

কেন?

আমাদের বললো, বড় ভাই মারা গিয়েছেন ওকে এখন দেশে গিয়ে চাষবাস দেখতে হবে। অনেক পাঞ্জাবীই ক্ষেত-খামার করে বলে আমরা কেউই অবিশ্বাস করলাম না। সালুজা আমাদের অনেককেই হোসিয়ার পুরের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে চলে গেল।

তারপর?

চাকরি ছাড়ার এক বছরের মধ্যে সালুজা মহারাণী বাগ'এ কমসে কম দু'তিন লাখ টাকা ব্যয় করে বাড়ি বানিয়ে ওখলায় ব্যবসা শুরু করল। রিপাবলিক টেলিভিসন তো ওরই কারখানায়

কেশব দত্ত বললেন, আরে ও শালাকে তো আমি খুব ভাল করে চিনি।

ইন্দুদা হাসতে হাসতে বললেন, উদ্যোগ ভবনে চাকরি করে শালা ছাড়া আর কাদের সঙ্গে তোর আলাপ হবে?

আমরা হাসি।

কেশব দত্ত বললেন, জান, কীভাবে ও টাকা কামাতো?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি ভাবে?

প্রতিদিনই ওর সাহেবের কাছে বহু বড় বড় ব্যবসাদার ইণ্ডাস্ট্রিয়া-লিস্টরা আসতেন। সালুজা ওদের সবার কাছ থেকে একশ' টাকা নিয়ে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিত।....

ইন্দুদা বললেন, বলিস কিরে?

যা বলছি ঠিকই বলছি। সকালের প্লেনে কলকাতা-বোম্বে-মাদ্রাজ-

ব্যাঙ্গালোর থেকে দিল্লী এসে সাহেবের সঙ্গে দেখা করেই ওরা আবার রাত্রেই বা পরদিন ভোরে ফিরে যেতেন। সালুজাকে একশ টাকা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেণ্ট পেয়ে ওদের অযথা দিল্লীর হোটেলে বসে থাকতে হতো না আর টাকাও বাঁচতো।

তা ঠিক।

রোজ যদি পনের-কুড়িজনকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিত তাহলে···

আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, রোজ দেড় হাজার দু'হাজার টাকা কামাতো!

সামান্য কিছু একে ওকে দিতে হতো। সাহেবকেও খুশী করার জন্য···

ইন্দুদা মুচকি হেসে বললেন, সাহেব নিজেও বেশ কামাতেন বলেই সালুজার এত সাহস হতো। মাথুর নিজেও তো এক নম্বরের ঘুষখোর বদমাইস ছিলেন।

কেশব দত্ত বললেন, রতনে রতন চেনে বলেই তো উনি সালুজাকে নিয়েছিলেন। এখন মাথুর সাহেব কি করেন জানিস?

কি?

সাত-আটটা বড় বড় কোম্পানীর ডিরেক্টর।

মনে মনে ভাবি উদ্যোগ ভবনে এলেই সবাই উদ্যোগী হতে চান কেন? মন্ত্রী থেকে চাপরাশী সবাই এখানে এসে একই মন্ত্রে দীক্ষিত হন কিন্তু কেন?

॥ তিন ॥

উদ্যোগ ভবন। ভারতীয় শিল্পপতিদের যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী।

বাস থেকে নেমে রাস্তা পার হবার পর রোজই একবার মুখ তুলে আমাদের উদ্যোগ ভবনকে দেখি। আগে, আমাদের ছোটবেলায় এখানে মাঠ ছিল। তারপর দেশ স্বাধীন হবার পর অফিস পাড়ায় সব চাইতে আগে কৃষি ভবন আর উদ্যোগ ভবন তৈরী হলো।

সেন্ট্রাল ভিস্তার এপারে-ওপারে হলেও মুখোমুখি। একই ডিজাইন। আশা করা হয়েছিল নতুন ভারতের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে মজবুত করার জন্য সব উদ্যোগের অনুপ্রেরণা জোগাবে এই উদ্যোগ ভবন। বাইরে থেকে উদ্যোগ ভবনকে যত ভাল লাগে ভিতরে গেলে তত ভাল লাগে না। চিড়ে চ্যাপ্টা করিডরগুলো যেন এক-একটা সুরঙ্গপথ আর তার দুপাশে অসংখ্য গুহা। কৃষি ভবনে কৃষিজীবীদের দেখা না গেলেও উদ্যোগ ভবনের চত্বরে সব সময়ই শতাধিক কোটিপতিকে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাবে। সারা ভারতবর্ষে এমন কোন শিল্পপতি নেই যিনি এখানে তৈল মর্দন করতে আসেননি। যে কোন উদ্যোগী পুরুষ উদ্যোগ ভবনে তৈল মর্দন করলে উদ্যোগপতি হতে পারেন। কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও হানড্রেড পার্সেন্ট সত্যি।

আমাদের ইন্দুদা কলকাতার বঙ্গবাসী স্কুলের ছাত্র। বঙ্গবাসী কলেজেও পড়েছেন। ইন্দুদার সঙ্গেই স্কুলে পড়তেন কৃষ্ণচন্দ্র বাগড়ী। কটন স্ট্রীটের অতি সাধারণ দোকানদারের ছেলে হলেও কৃষ্ণচন্দ্র কলকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে এম কম পাশ করার পরই কটন স্ট্রীট যাতায়াত শুরু করেন। দু-তিন বছর পর নিজে স্বাধীনভাবে একটা পেট্রল পাম্প চালান শুরু করলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের বিয়ে হলো দিল্লীতে। সেজন্য মাঝে মাঝেই দিল্লীতে আসতেন। একবার দেওয়ালীর আগে দিল্লী আসার সময় কালকা মেলের কামরায় আলাপ হলো তেওয়ারী সাহেবের সঙ্গে। তেওয়ারী সাহেব টেকনিক্যাল ডেভলপমেন্টের একজন ডেভলপমেন্ট অফিসার। পুরো চব্বিশ ঘণ্টা একসঙ্গে ট্রেনের কামরায় কাটিয়ে বেশ বন্ধুত্ব হলো দুজনের মধ্যে। কথা হলো দিল্লীতেও দেখাশুনা হবে। কৃষ্ণচন্দ্র সস্ত্রীক একদিন ওর বাড়ি গেলেন, উনিও সস্ত্রীক পুসা রোডে কৃষ্ণচন্দ্রের শ্বশুরবাড়ি ঘুরে গেলেন। কখনও কখনও ঘুরতে ফিরতে বেরিয়ে উদ্যোগ ভবনের কাছাকাছি এলে কৃষ্ণচন্দ্র তেওয়ারীর ঘরে বসে এককাপ চা-কফি খেয়েই বাড়ি ফিরতেন। একদিন হঠাৎ ইন্দুদার সঙ্গে দেখা।

আরে ইন্দু না?

কেষ্ট!

উদ্যোগ ভবনের করিডরেই দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর শুরু হলো খোঁজ-খবর নেওয়া। কৃষ্ণচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন তুই এখানে কি করছিস?

কি আর করব? গোলামী করছি।

কলকাতা ছাড়লি কবে?

বহুকাল। তুই এখানে কেন? নিশ্চয়ই ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে কিছু?

নারে ভাই! আমি কি দিল্লীওয়ালা যে মিনিস্টার সেক্রেটারীর খাতিরে লাইসেন্স পারমিট পেয়ে যাব।

কিন্তু লাইসেন্স পারমিট ছাড়া অন্য কাজে তো এখানে কেউ আসে না?

বাগড়ী হাসতে হাসতে বললেন, আমি নিছক এক কাপ কফি খেয়ে একটু আড্ডা দিতে এসেছিলাম।

কার কাছে?

ডি জি টি ডি'র এক ডেভলপমেন্ট অফিসার মিঃ তেওয়ারীর কাছে।

উনি কি তোর বন্ধু নাকি?

এবার দিল্লী আসার সময় ট্রেনে আলাপ হলো।

এটা বেশ ক'বছর আগেকার ঘটনা। এরপর বছর দুই তেওয়ারী সাহেব আর ইন্দুদার কাছে হাঁটাহাঁটি করে বাগড়ী সাইকেল টায়ার তৈরীর ছোট একটা কারখানা চালু করলেন গাজিয়াবাদে। তারপর আরো কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন আর স্টেট ব্যাঙ্কের উদার সাহায্যে স্কুটার রিকসার মিটার তৈরীর কারখানা করেছেন। প্রতি মঙ্গলবার হনুমানজীর মন্দিরে যেতে ভুলে গেলেও মিঃ বাগড়ী তেওয়ারীজীর পূজা দিতে ভুলে যান না। বাগড়ী আর পুসা রোডের শ্বশুরবাড়িতে থাকেন না। গ্রেটার

কৈলাসে বাড়ি কিনেছেন, কার্জন রোডে অফিস করেছেন। শুনছি মরিসাসে একটা ইণ্ডাস্ট্রি করার উদ্যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ। কেষ্ট ঘোষ বলে ইন্দুদার বাড়ি তৈরীর জন্য বাগড়ী প্রচুর সাহায্য করেছেন।

আমি বললাম, যদি ধরা পড়েন তাহলে তো....

কেষ্ট ঘোষ চার্মিনার টানতে টানতে বললো, পুরানো বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়েছে। এতে ধরা পড়ার কি আছে ?

কেশব দত্ত বললো, কোন না কোন কেষ্ট যদি সাহায্য না করত তাহলে কি পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার সরকারী লোন দিয়ে ও বাড়ী তৈরী হতো ?

কেষ্ট ঘোষ বললো, ইন্দুর বাড়িতে কমসে কম সত্তর হাজার লেগেছে।

কেশব দত্ত বললো, ইন্দু শালার সেকসন অফিসারটিও একটি রাম ঘুঘু। আমি তো ওর আণ্ডারে কাজ করেছি।

আমি এসব কথা শুনি। শুনতে হয়। ইচ্ছা না থাকলেও শুনতে হয় কিন্তু সত্যি ভাল লাগে না। বছরে বারো মাসই লাঞ্চের সময় একসঙ্গে চা-টা খাই, আড্ডা দিই, নিজেদের সুখ-দুঃখের আলোচনা করি। বয়সে ছোট বড় হলেও আমরা বন্ধু। একজনের বিপদে অন্যেরা ছুটে যাই। না গিয়ে পারি না। আগে কেষ্ট ঘোষ আর ইন্দুদা লক্ষ্মীবাঈ নগরে পাশাপাশি কোয়ার্টারে থাকতেন। কেষ্ট ঘোষ ভাইঝির বিয়ের জন্য বর্ধমান গিয়েছিলেন। হঠাৎ একদিন সকাল বেলায় বাথরুমে পড়ে কেষ্ট ঘোষের স্ত্রীর পা ভাঙল। ইন্দুদাই ওকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সফদারজং হাসপাতালে গিয়েছিলেন। তারপর আমাদের খবর দিয়েছিলেন। আমরাও ছুটে গিয়েছিলাম হাসপাতালে। কেষ্ট ঘোষের ছেলেমেয়েরা ইন্দুদার বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করত। সেই কেষ্ট ঘোষের মুখে ইন্দুদার নিন্দা শুনতে সত্যি ভাল লাগে না। কেষ্ট ঘোষও ইন্দুদার অনেক বিপদের দিনে সব চাইতে আগে ওর পাশে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু তবুও ইন্দুদা সুযোগ পেলেই বলবেন, কেষ্টর মুখে

বড় বড় কথা শুনলেই মেজাজ গরম হয়ে যায়। এখনও ওর কাছে আমি তিনশ' টাকা পাবো।

কেশব দত্ত বললেন, শুধু তুমি কেন, কেষ্টর কাছে কে টাকা পাবে না? পানওয়ালা-মুদি, ছুতোর মিস্ত্রি, ধোপা, কাপড়ের দোকানদার থেকে শুরু করে প্রেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া পর্যন্ত ···

আমি বললাম, আমি কিছু পাব না।

ইন্দুদা বললেন, তোমার ভাগ্যের জোর আছে বলেই কেষ্টর কাছ থেকে টাকা ফেরত পেয়েছ।

না, না, উনি আমার কাছ থেকে কোন কিছু নেন নি।

ইন্দুদা আর কেশব দত্ত একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠলেন, সে কি?

হ্যাঁ। উনি সত্যিই কোনদিন···

কেশব দত্ত বললেন, তাহলে নিল বলে।

আমি অর্থনীতি পড়ি নি। কিছুই বুঝি না। তবে মনে হয় ধার না করে এ দেশে কেউ বাঁচতে পারেন না। টাটা-বিড়লা থেকে কেষ্ট ঘোষ পর্যন্ত সবাইকেই ধার নিতে হয়। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সমাজ ধারের উপরেই টিকে আছে। টাটা-বিড়লা মন্ত্রী—এম-পি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিতে পারেন কিন্তু কেরানী, মধ্যবিত্তকে কোন ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেবে না। দেয় না। সুতরাং কেষ্ট ঘোষ যদি ধার নেন তাহলে এত আলোচনার কি আছে?

কেরানীর নিন্দা না করে কেরানী বাঁচতে পারে না। নিজেদের ব্যর্থতা, দৈন্য ঢাকার জন্য কেরানীকে পরনিন্দা করতেই হবে। মজার কথা পরনিন্দা করার সময় টের পাই না অনধিকার চর্চা করছি। হেমন্ত সরকার বলেন, রাত্রে বৌ আর দিনে পরনিন্দাই তো কেরানীদের একমাত্র এণ্টারটেনমেণ্ট। বিনা পয়সায় এর চাইতে ভাল আনন্দ আর কি হতে পারে?

কলকাতায় কেরানীরা অফিসারদের ঈর্ষা করে, হিংসা করে। এখানে কেরানীরাই কেরানীদের ঈর্ষা করে। কলকাতায় অফিসের বাইরে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই কেরানী আর কেরানী থাকেন না।

তার একটা সামাজিক সত্তা, মর্যাদা আছে। পাড়ায়, ক্লাবে, খেলার মাঠে, রবীন্দ্র-সদনে, গড়িয়াহাট-বৈঠকখানা বাজারে। সর্বত্র। এখানে কেরানীরা চব্বিশ ঘণ্টাই কেরানী। অফিস থেকে বেরিয়ে বাসের লাইনে কেরানীর ভীড়, বাড়ি সরকারী কেরানী কলোনীতে, পাড়ার বাজারে শুধু কেরানীরাই খদ্দের, বেড়াতে যেতে হয় পাড়ার কেরানী বাড়ি, সন্ধ্যার পর গল্প করতে আসেন প্রতিবেশী কেরানীর দল, কেরানীরাই পাড়ার ক্লাবের সদস্য, কালীবাড়ির মাতব্বর, থিয়েটার যাত্রার প্রতিটি অভিনেতা পর্যন্ত কেরানী। অফিসের বাইরে কেরানীর জীবনে আর কারো কোন ভূমিকা নেই।

কি সরকারবাবু, আপনার পিছন দিকের ঘোষবাবুরা বলে জয়পুর বেড়াতে যাচ্ছেন?

আমি বললাম, তা তো জানি না বৌদি।

গঙ্গা, তুমি নিশ্চয়ই জান।

গঙ্গা ছোট্ট জবাব দিল, বোধহয় যাচ্ছেন।

রায় বৌদি গঙ্গার পাশে বসতে বসতে বললেন, বেশ আছেন ঘোষবাবুরা। আজ জয়পুর, কাল হরিদ্বার, পরশু কলকাতা লেগেই আছে ওদের।

গঙ্গা বললো, ঘোষদা বেড়াতে খুব ভালবাসেন।

ঘুরে বেড়াতে কে না ভালবাসে? কিন্তু ট্যাঁকের জোর থাকা দরকার।

রায়দা আমাদের দুজনের দিকে একটু ইসারা করে ওর স্ত্রীকে বললেন, তুমি আর তোমার দু' মেয়ে সিনেমা দেখা বন্ধ করলে আমিও প্রত্যেক বছর তোমাদের হরিদ্বার ঘুরিয়ে আনতে পারি।

এর থেকে আমাদের মুক্তি নেই। প্রতিদিন এরকম গ্লানি সঞ্চয় করছি।

তলোয়ার সাহেব যে রাম ঘুঘু সেকথা উদ্যোগ ভবনের সবাই জানেন। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইণ্ডাস্ট্রি চালাতে হলে তলোয়ার সাহেবের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ না করে উপায় নেই।

উত্যোগ ভবনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবি, কত শত সহস্র তলোয়ার আর বাগড়ীর পাদস্পর্শে উত্যোগ ভবন ধন্য। আনন্দমুখর বিয়েবাড়ির একান্ত নির্জন কক্ষে কক্ষে যেমন পণ দেওয়া-নেওয়া হয়, তেমনি উত্যোগ ভবনের সব উত্যোগের পিছনেই কোন না কোন তেওয়ারী বা তলোয়ার থাকবেনই। যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ। আমি ঘুষ না খেলেও বছরে দু-চারটে জামা-প্যান্টের পিস্ দুটো-একটা জাপানী জর্জেট শাড়ী পেয়েই যাই। নেবার সময় বলি, সামনের মাসে দাম দেব কিন্তু সে দাম কোনদিনই দিই না। দেবার দরকার হয় না।

একেবারে প্রথম দিকে বুঝতে পারতাম না। ভাল্লার অনুরোধে দু'চারটে ফাইল চটপট আমাদের সেক্সন থেকে বের করে দেবার কিছুদিন পরেই হঠাৎ দুটো প্যান্টের পিস আমাকে দিয়ে বললো, সরকার হ্যাভ ইট।

তার মানে?

বলছি রেখে দাও।

কিন্তু দাম?

সে পরে দেখা যাবে।

বাড়ি এসে দুটো প্যান্টের কাপড় দিয়ে যাবার জন্য আমি ভাল্লাকে অশেষ ধন্যবাদ জানালাম। দু'চার মাস পরে ভাল্লা আবার একটা স্যুট লেন্‌থ্‌ দিয়ে গেল।

আরে ভাই আগের কাপড়ের দামই দিলাম না···

দামের জন্য তুমি এত ব্যস্ত কেন? তুমি কি পালিয়ে যাচ্ছ?

বেশ কিছুকাল পরে ভাল্লা বলেছিল, সরকার, উত্যোগ ভবনে যখন ঢুকেছ তখন এরকম জিনিষপত্র আরো পাবে। দাম লাগবে না। লাগে না। তোমার সেক্সনের সবাইকেই এই রকম প্রেজেনটেশন দিয়েছি।

সবাইকে?

জি হাঁ।

কেন? সবাই কি···

আমেরিকার ওয়েস্ট কোস্ট এঞ্জিনিয়ারিং'এর সঙ্গে এখানকার

আনন্দ ইণ্ডাস্ট্রির কোলাবোরেশনের ব্যাপারে তোমাদের সেক্সনের সবাই খুব সাহায্য করেছে বলে....

আস্তে আস্তে জানলাম আনন্দ ইণ্ডাস্ট্রি থেকে ভাল্লাকে মোটা টাকা মাসোহারা দেয়। তাছাড়া এই কোলাবোরেশনের প্রস্তাব যাতে সরকারী স্বীকৃতি পায় তার জন্য আনন্দ ইণ্ডাস্ট্রি প্রচুর টাকা ব্যয় করেছে। শুধু এদের নয়, শুধু কোলাবোরেশনের জন্য নয়, ব্যবসা-বাণিজ্যের সব কাজের জন্যই সব কোম্পানীকেই উদ্যোগ ভবনের পাণ্ডাদের প্রণামী দিতে হয়। সে প্রণামীর সামান্য কিছু ভাগ আমারও অদৃষ্টে জুটে যায়।

প্রথম প্রথম গঙ্গা ভীষণ রাগ করতো। বলতো, শেষ পর্যন্ত তুমিও ঘুষ খাচ্ছ?

বিশ্বাস কর, উদ্যোগ ভবনের পরিভাষায় এসব প্রেজেনটেশন নেওয়াকে ঘুষ খাওয়া বলে না।

তবে কি বলে?

বলে টোকন অফ্ লাভ এ্যাণ্ড ফ্রেণ্ডশিপ্।

চমৎকার।

তাছাড়া আরো একটা ব্যাপার আছে।....

কি ব্যাপার?

যদি আমি এসব টুকটাক প্রেজেনটেশন না নিই তাহলে অন্যসব বন্ধুরা আমাকে সন্দেহ করবে, বিশ্বাস করবে না।

কেষ্ট ঘোষ তো ইন্দুদার খুব নিন্দে করে কিন্তু ও শালাই কি পয়সা দিয়ে জুতা কেনে? যেদিন থেকে আমরা রাশিয়াতে জুতা চালান দেওয়া শুরু করেছি সেই দিন থেকে কেষ্ট ঘোষের হোল ফ্যামিলীর জুতোর খরচ নেই!

লাঞ্চের আড্ডায় ইন্দুদা হাসতে হাসতে বললেন, কেষ্ট আজকাল বৌকে হাই হিল জুতো পরাচ্ছে।

কেষ্ট ঘোষও হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, আহুজা কোম্পানী ভালবেসে যা দিয়েছে তাই বৌকে পরাই।

তাই বলে বৌকে হাই হিল ! এই বয়সে কখনও ওসব মানায় ?

আছজারা যে শুধু ঐ ধরনের জুতোই এবার রাশিয়া আর পোল্যাণ্ডে পাঠিয়েছে।

তুই তো রাশিয়ান বা পোলিশ মেয়েকে বিয়ে করিস নি যে···

কেষ্ট ঘোষ খুব জোরে চার্মিনারে টান দিয়ে বললেন, আমার বৌ তো দূরের কথা, আমার জয়েণ্ট সেক্রেটারীর মা থেকে শুরু করে বেয়ারা গুরবচন সিং'এর বৌ পর্যন্ত ঐ একই ধরনের জুতো এখন ব্যবহার করছেন।

কেশব দত্ত বললেন, এবার ভাবছি কেষ্টর ব্রাঞ্চেই চলে যাব।

ইন্দুদা বললেন, তুমিই বা শালা কি খারাপ আছো ? লরীওয়ালাদের লরীর টায়ার পাইয়ে দিয়ে····

কেশব দত্ত বললেন, সে তো আর প্রত্যেক মাসে কোম্পানীদের বলতে পারি না।

ওরে শালা, লরীর টায়ার কি একটা কোম্পানীই বানায় ? এক একটা কোম্পানীকে তিন-চার মাস অন্তর বললেই তো তোর····

তাতে আর কত হয় !

বাজারে দেড় হাজার-দু'হাজার টাকা বেশী দিয়ে লরীর টায়ার বিক্রী হচ্ছে। তুই নিশ্চয়ই হাজার খানেক····

তোর মাথা খারাপ ? তাহলে তো আমিও তোর মতন বাগড়ী ভবন বানাতে····

ইন্দুদা রেগে যান, বাজে ফাজলামী করিস না।

সত্যি কথা বলছি সবাইকে দিয়ে থুয়ে আমি আড়াইশ-তিনশ'র বেশী পাই না।

এবার কেষ্ট ঘোষ চার্মিনারে শেষ সুখ টান দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কতজনকে সাইকেল টায়ারের এজেন্সী পাইয়ে দিয়েছিস বলতো ?

কতজনকে আবার ? বোধহয় তিন-চারজনকে !

এবার এক থাপ্পড় খাবি।

কেশব দত্ত দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বললেন, হয়ত দু'একজন বেশী হতে পারে।

ইন্দুদা জিজ্ঞাসা করলেন, এক একজনকে এজেন্সী পাইয়ে দিয়ে নিশ্চয়ই হাজার দশেক করে....

আরে দূর! ম্যাক্সিমাম পেয়েছি ছ'হাজার। আর সব চার বা পাঁচ।

যাদবপুরের বাড়িটা তাহলে সাইকেল টায়ার দিয়েই বানিয়েছিস, কি বল?

প্রায় তাই।

বাস থেকে নেমে রাস্তা পার হয়ে আমাদের উদ্যোগ ভবনের দিকে তাকালেই এইসব কথা মনে পড়ে। পড়বেই। মন থেকে কিছুতেই এসব চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না। সকালে, যখন বাড়িতে থাকি, গঙ্গাকে কাছে পাই, তখন এসব কথা, নোংরামী মনে আসে না। আবার সন্ধ্যার পর যখন বাড়িতে গঙ্গার কাছে ফিরে যাই, তখন উদ্যোগ ভবনের সব স্মৃতি কোথায় যেন লুকিয়ে পড়ে। হারিয়ে যায়। মন্দির-মসজিদে গিয়ে মহাপাপীও অন্তত কিছুক্ষণের জন্য শুভ চিন্তা করে। ভগবানের নাম স্মরণ করে। তীর্থক্ষেত্রে মহা স্বার্থপর ব্যবসাদারও উদার হাতে দরিদ্রনারায়ণের সেবা করেন। স্থান মহাত্ম্যে নিজের স্বার্থ, ক্ষুদ্রতার কথা মনে আসে না। শ্মশানে যেমন শ্মশান বৈরাগ্য দেখা দেয়, উদ্যোগ ভবনে এলে তেমনি আসক্তি আর লোভে মন বিষিয়ে যাবেই।

উদ্যোগ ভবনের চত্বরে পা দিতেই মনটা কেমন সঙ্কুচিত হয়ে যায়। যেটুকু শুভবুদ্ধি ও কল্যাণ চিন্তা আমার মাথায়, মনে আছে, তাও হারিয়ে ফেলি। প্রত্যেকটা মানুষকে স্বার্থপর ও অর্থপিশাচ মনে হয়। যে যত সামান্য ও সাধারণ অনুরোধই করুক না কেন মনে হয় এর পিছনে ওর কোন স্বার্থ নিশ্চয়ই জড়িয়ে আছে। কয়েক বছর আগে এই রকম অফিসে ঢোকার মুখেই নির্মাণ ভবনের নারায়ণ ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা। দূর থেকে আমাকে দেখতে পেয়েই ও ডাকল, সরকারদা!

আমি দাঁড়াতেই ও এগিয়ে এসে বললে, সরকারদা, একটা কাজ করে দিতেই হবে।

কি কাজ?

আমার এক বন্ধুর ভগ্নিপতি বহু বছর ধরে বিলেতে ব্যবসা করে অনেক টাকার মালিক। তিনি এখন আমাদের দেশের ওদিকে একটা ফ্যাক্টরী করতে চান...

কিসের ফ্যাক্টরী?

অটোমেটিক স্ক্রু। ডি জি টি ডি এ্যাপ্রুভ করে দিয়েছে কিন্তু এক বছরের উপর আপনাদের মিনিস্ট্রিতে পড়ে আছে...

এক বছর?

হ্যাঁ দাদা! ইতিমধ্যে উনি দুবার বিলেত থেকে এসে ঘুরে গিয়েছেন। কিন্তু মাসখানের মধ্যে যদি ফাইন্যাল ক্লিয়ারেন্স না পান তাহলে ..

হাতের ঘড়িটা দেখে নিয়ে বললাম, এখন তো সময় নেই। তুমি একবার পরে দেখা করো। সব শুনে নিই। তারপর দেখি কি করা যায়।

পরে নারায়ণ বলেছিল সবকিছু। কে সি রায় এককালে শ্যামবাজারের মোড়ে খবরের কাগজ বিক্রী করতেন। তারপর জাহাজের খালাসী হয়ে প্রথমে যান আমেরিকা, পরে বিলেত। সেখানে গিয়ে প্রথম দু'বছর সিজেটি রেস্টুরেন্টে প্লেট ধুতেন, বাসন মাজতেন। থাকা-খাওয়া ফ্রি। এছাড়া প্রথম বছর মাইনে পেতেন উইকে পাঁচ পাউণ্ড, পরের বছর ছয় পাউণ্ড। জামা-কাপড়ের জন্য সামান্য কিছু ব্যয় করা ছাড়া একটি পেনি বাজে খরচ করেন নি কে সি রায়। ঐ দুই বছরের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে শুরু করলেন ব্যবসা।

বেশ গর্বের সঙ্গে নারায়ণ বললো, যে এককালে রেস্টুরেন্টে বাসন মাজতো, সে এখন কত টাকার মালিক জানেন?

নিশ্চয়ই লক্ষপতি।

কিছু না হলেও সত্তর-আশী লাখ টাকার মালিক।

লাঞ্চ আওয়ারে সেণ্ট্রাল ভিস্তার মাঠে বসে বসে নারায়ণের কাছে আরো অনেক কিছু শুনলাম। মিঃ রায় ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগিয়ে শতখানেক গরীব আত্মীয়-বন্ধুকে বিলেত নিয়ে গিয়েছেন। অন্তত দশ-বারোজন মেরিটোরিয়াস ছেলেকে বিলেতে পড়াশুনার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এছাড়া কলকাতার বহু পরিচিত মানুষের আপদে-বিপদে নানা রকমের সাহায্য করেন। সব শেষে নারায়ণ বললো, ওর মেজ ছেলে এঞ্জিনিয়ার হয়েছে। ঐ ছেলের খুব ইচ্ছা এখানে কিছু করে। তাই এই ফ্যাকটরীটা বসিরহাটে হলে আমাদের এরিয়ার বহু ছেলের উপকার হবে।

মুখে বললাম, তা তো বটেই কিন্তু মনে মনে বললাম, সবই তো বুঝলাম তবে এই নাটকে তোমার কি ভূমিকা তা তো ঠিক ধরতে পারছি না। মনে মনেই ফিস ফিস করে বললাম, দশ-বিশ হাজার নিশ্চয়ই পাচ্ছ, তাই না নারায়ণ ?

নারায়ণ আবার বললো, আপনি বললে আমি সব কাগজপত্র দিয়ে যাব···

দিয়ে যেও। নিশ্চয়ই দেখব।

আপনার তো বহু জানাশুনা। আপনি একটু দেখলেই কাজ হয়ে যাবে।

পরের রবিবার সকালের দিকে বাড়ি এসে নারায়ণ কাগজপত্র দিয়ে গেল কিন্তু আব কিছু বললো না। মনে মনে আশা করেছিলাম নারায়ণ কাগজপত্রের সঙ্গে আরো কিছু দেবে। আর একান্তই যদি না দেয় তাহলে ভবিষ্যতের জন্য কিছু প্রতিশ্রুতি দেবে, কিন্তু ওসব সম্পর্কে একটি কথাও বললো না। আমি কিছু না নিলেও অন্যদের তো কিছু দিতেই হবে। কিছু না ছড়ালে তো ফাইল খুঁজেও পাওয়া যাবে না। তাছাড়া এসব ব্যাপারে আমি কিছু উৎসাহ দেখালেই মিঃ ভোরা ছাড়াও আমার বাঙালী বন্ধুরাও সন্দেহ করবে। আমি প্রতিশ্রুতি দিলেও কিছুই করলাম না। কয়েক মাস পরে এসে নারায়ণ সব কাগজপত্র নিয়ে গেল। বললাম, ভাই, আমার মত

চুনোপুটি দিয়ে এত বড় কাজ হওয়া মুস্কিল। দু-একজন বড় কর্তাকে হাত না করলে কাজ হবে না।

নারায়ণ শুধু বললো, মিঃ রায় নিজে এত অনেস্ট যে এক পয়সা ঘুষ দেবেন না বলেই যত মুস্কিল।

আমি ভালমানুষের মত বললাম, যারা ঐভাবে বড় হয়েছেন তাঁরা এইসব নোংরামী করবেন কিভাবে?

তা তো বটেই। নারায়ণ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললো, তাছাড়া পঁয়ত্রিশ বছর বিলেতে কাটাবার পর উনি কল্পনাই করতে পারেন না ঘুষ না দিলে এখানে কাজ হয় না।

আমি একটু হাসলাম।

নারায়ণ উঠবার সময় বললো, এরপর উনি যখন বিলেত থেকে আসবেন তখন আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। নিশ্চয়ই আপনার ভাল লাগবে।

প্রায় বছরখানেক পরে মিঃ রায় এলে নারায়ণ প্রায় জোর করেই আমাকে ওর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। সেই প্রথম আমি অশোকা হোটেলে গেলাম।

আমার মত সামান্য কেরানীরা দূর থেকেই অশোকা হোটেল দেখে। ভিতরে যাবার কোন অবকাশ আমাদের নেই। হতে পারে না। এতকাল দূর থেকেই অশোকা হোটেল দেখেছি। দিনে, রাত্রে। দিনে মনে হয় প্রাসাদ, রাত্রে স্বপ্নপুরী। এখানে কি আমাদের প্রবেশাধিকার থাকতে পারে? না। অসম্ভব।

সম্রাট অশোকের নামে প্রতিষ্ঠিত এই হোটেলের মালিক ও পরিচালক ভারত সরকার। কিন্তু বিশুদ্ধ ইংরেজি বানানের ভুল উচ্চারণ অনুকরণ করে সবাই বলেন অশোকা হোটেল। ভগবান বুদ্ধের অনুগামী অশোকের স্মৃতি-বিজড়িত হোটেলে উলঙ্গ যুবতীর নৃত্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা না থাকলেও জৈবিক তৃপ্তির উদার আয়োজন আছে। অশোক স্তম্ভ, অশোকের ধর্মচক্র স্বাধীন ভারত সরকারের ললাটে সগর্বে লটকান। সিদ্ধিদাতা গণেশের মত ভারত সরকারের

সব কাজে ও অকাজে অশোক স্তম্ভ থাকবেই। সম্রাট অশোক নিশ্চয়ই কল্পনা করেন নি স্বাধীন ভারতে তাকে এমন অভূতপূর্ব সম্মান ও স্বীকৃতি দেওয়া হবে। ভগবান বুদ্ধের এই অনুগামীকে শ্রদ্ধা জানাবার আতিশয্যে ভারত সরকার কোটি কোটি টাকা ঢেলে বানালেন অশোকা (?) হোটেল। যে সম্রাট ত্যাগ আর তিতিক্ষার জন্য ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন ও ভবিষ্যতেও থাকবেন, তার নামে ভোগ-সম্ভোগের এই প্রাসাদপুরী বানাবার তাৎপর্য আমি ঠিক বুঝি না। হয়ত আগামী দিনের ভারত সরকার বিদেশী টুরিস্টদের চকচকে ডলারের লোভে ভগবান বুদ্ধের নামে নাইট ক্লাব খুলবেন।

সে যাই হোক অশোকা হোটেলের গল্প বহুজনের মুখে শুনি। ভারত সরকারের অতিথি, বোম্বের ফিল্ম স্টার ও বিদেশী ধনী টুরিস্টদের কৃপায় খবরের কাগজের পাতায় এর নিয়মিত উল্লেখ। খবরের কাগজ পড়তে গেলেই চোখ পরে আর মনে মনে ভাবি গণতান্ত্রিক সমাজ-তান্ত্রিক ভারতবর্ষে কত কি ভারতীয়দের ধরাছোঁয়ার বাইরে। প্রবেশ নিষেধ।

অশোকা হোটেলে ঢুকতে গিয়েই একটু থমকে দাঁড়ালাম নারায়ণকে বললাম, এসব জায়গায় আমরা কেমন যেন বেমানান।

নারায়ণ হাসল। কিছু বললো না।

আমি বললাম, এখানে আমাকে না আনলেই ভাল করতে।

তাতে কি হয়েছে? যাচ্ছি হোটেলের একজন গেস্টের কাছে।

এই হোটেলে যখন আছেন তখন তিনিও সেই রকমই লোক তার কাছে কি····

আমি আর কি বলব দাদা! তবে পাঁচ মিনিট পরেই বুঝবে উনি কি ধরনের মানুষ।

সত্যি বুঝলাম। ভদ্রলোক কত লাখ টাকার মালিক তা জানতে না পারলেও বুঝতে কষ্ট হল না, মিঃ রায় সত্যি অনেক টাকার মালিক আর বুঝলাম ভদ্রলোক সত্যি মানুষ ভালবাসেন, তাদের উপকা

করতে চান। অত টাকা থাকা সত্ত্বেও ভদ্রলোকের কোন অহংকার নেই দেখেও বড় ভাল লাগল। অফিস ছুটির পর গিয়েছিলাম। কথায় কথায় রাত হয়েছিল। উনি কিছুতেই না খেয়ে আসতে দিলেন না। খাওয়া-দাওয়ার পর নারায়ণকে বললেন, তুমি তো ড্রাইভারকে চেনো। ওকে বলো তোমাদের পৌঁছে দিতে। ভদ্রলোক যে সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট বোঝেন তা দেখে সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

মিঃ রায়ের একটা কথা এখনও আমার মাঝে মাঝেই মনে পড়ে। উনি বলেছিলেন, সোমনাথবাবু, কোন কাজে হাত দিয়ে পিছিয়ে যাবার লোক আমি নই। ভেবেছিলাম নারায়ণের মত সৎ ছেলেকে দিয়েই কাজ হবে কিন্তু হলো না। ইণ্ডিয়াতে আমি ফ্যাক্টরী করবই তা সে যেভাবেই হোক।

মিঃ রায় সত্যি ফ্যাক্টরী করেছেন। দিল্লীর উপকণ্ঠে, হরিয়ানার ফরিদাবাদে মেশিন টুলের বিরাট ফ্যাকটরী খুলেছেন। কয়েক শ' লোক সে ফ্যাক্টরীতে কাজ করে। এশিয়া সেভেনটি-টুর প্রদর্শনীতে ঘুরতে গিয়ে একটা বিরাট স্টলে ঢুকে দেখি মিঃ রায় ও নারায়ণ কথা বলছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা নিশ্চয়ই আপনার···

আমার নয়, আমাদের।

আমাকে আর গঙ্গাকে চা খাওয়াবার পর মিঃ রায় নিজেই বললেন, আপনাদের দেশের একজন আই সি এস গভর্ণর আমার খুব বন্ধু। তাঁর এক পরমাত্মীয়াকে একবার বিলেত ঘুরিয়ে দিতেই আমার সব কাজ হয়ে গেল। এমন কী আমাকে একবারও আপনার উদ্যোগ ভবনে যেতে হয় নি।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমরা বিনা যুদ্ধে হারতে পারি কিন্তু বিনা ঘুষে উদ্যোগ ভবনে ফাইল নড়াতে শিখি নি।

সোমনাথবাবু, আমরা বিদেশে থাকি। দেশের খবরের কাগজ পড়েই আমরা দেশের খবর জানতে পারি।····

আমি মিঃ রায়কে সমর্থন জানাই, তাছাড়া আর কিভাবে আপনারা দেশের খবর রাখবেন।

খবরের কাগজ পড়ে ভেবেছিলাম আমাদের মত সাধারণ মানুষ কলকারখানা খুলতে চাইলে গভর্নমেণ্ট সব রকম সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন কিন্তু আসলে দেখলাম খবরের কাগজে যা পড়ি তা সব বাজে কথা।...

আমি হাসি।

আপনি হাসছেন সোমনাথবাবু? আমি অনেক দুঃখে কথাগুলো বলছি। আমি আগে কল্পনাই করতে পারতাম না লাটসাহেবকে আমি ঘুষ দেব।..

আপনি কি লাটসাহেবকে টাকাও দিয়েছেন?

না, না, ক্যাশ টাকা হাতে করে নেন নি কিন্তু তার নিয়ারেস্ট রিলেসান্সের লণ্ডন ঘুরে আসার সব খরচ আমিই দিয়েছি।

তা তো শুনেছি।

আমি এ নোংরা কাজ করতাম না কিন্তু একে অনেক টাকা খরচ হয়েছিল, তার উপর মনে মনে হার স্বীকার করতে বড় লজ্জা হলো। তাই....

অনেকক্ষণ ধরে গল্পগুজব করার শেষে মিঃ রায় বললেন, আমি খুব গরীব ঘরের ছেলে। লেখাপড়া শেখবার মত পয়সা-কড়ি বাবার ছিল না। শ্যামবাজারের মোড়ে খবরের কাগজ বিক্রী করেছি বহুকাল।....

নারায়ণের কাছে আমি এসব কথা শুনেছি।

লেখাপড়া না শিখলেও আমি নিরেট মূর্খ বা বোকা নয়।

ছি ছি তা কেন হবেন?

কিছু অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি আমার আছে। তাই বলছিলাম, যে দেশের লাটসাহেব ঘুষ খায়, সে দেশের ভবিষ্যৎ বিশেষ সুবিধার নয়। এত করাপটেড লোকজন দিয়ে এ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালালে দেশের কিছুই উন্নতি হতে পারে না।

হঠাৎ রামজীবনের কথা মনে পড়ল।

রামজীবন কলকাতার ছেলে। বাবা-মা ভাই-বোন সবাই কলকাতায়।

ও এখানে চাকরি করলেও মন-প্রাণ কলকাতাতেই পড়ে থাকে। ছুটি পেলেই ছেলে-বৌ নিয়ে কালকা মেলে চাপে। রামজীবন সাহিত্যিক না হলেও সাহিত্যরসিক। ও বলে, যদি কেউ লিখতে পারেন তাহলে লালকেল্লার চাইতে উদ্যোগ ভবনের কাহিনী কম ইণ্টারেস্টিং হবে না। মোগল সম্রাটের খামখেয়ালীপনার জন্য লালকেল্লার দরবারে কত মানুষের স্বপ্ন ও সাধনা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, কত পুরুষকে যেতে হয়েছে কারাগারের অন্তরালে, সতীত্ব আর কৌমার্য বিসর্জন দিতে হয়েছে কত মেয়েকে।

রামজীবনের কথা শুনতে বেশ ভাল লাগে। তাই চুপ করে আমরা ওর কথা শুনি।

ও আবার শুরু করে, একবার ভাবুন তো সারা দেশের কত হাজার হাজার মানুষ নতুন নতুন শিল্প-বাণিজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে এখানে এসে ভগ্ন হৃদয় নিয়ে ফিরে যান। একবার ভেবে দেখুন এই উদ্যোগ ভবনের কত চরিত্রহীন, লম্পট অফিসারদের লালসা মেটাবার জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যায় কত যুবতীকে বিলিয়ে দিতে হয় তাদের রূপ-যৌবন আর বয়ে যায় কত শত সহস্র বোতল হুইস্কী।

রামজীবন একটু থেমে একটু হাসে। বলে, আমাদের এই উদ্যোগ ভবন কি কম মানুষকে কারাগারে পাঠিয়েছে? আবার কম স্তাবককেও লক্ষ—কোটিপতি করা হয় নি এই বহু নিন্দিত বহু আলোচিত উদ্যোগ ভবনের কৃপায়।

হঠাৎ শুনলে মনে হয় কোন নাটকের ডায়লগ শুনছি কিন্তু স্থিরভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারি রামজীবন মিথ্যা বলে নি। ষাট-পঁয়ষট্টি কোটি লোকের এই উপমহাদেশ ভারতবর্ষের কত লক্ষ লক্ষ শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান আছে। প্রতি শহর-নগরের টেলিফোন ডাইরেকটরী ভর্তি তাদের নাম। এরা ছড়িয়ে রয়েছে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, কচ্ছ থেকে কামরূপ। বন-জঙ্গল, সমুদ্র-পর্বত সর্বত্র। এদের চাবি-কাঠি উদ্যোগ ভবনে। শাঁখের করাতের মত চাবি-কাঠি যেদিকেই ঘুরুক, বিনা নৈবেদ্যে ভবনের দেবতারা কি সন্তুষ্ট হবেন?

রামজীবনের কাছেই কলকাতা কর্পোরেশনের একটা গল্প শুনেছি। এক ভদ্রলোক কি একটা কাজে কর্পোরেশনে গিয়ে বেরিয়ে আসার সময় সিঁড়িতে তার একটা টাকা পড়ে যায়। অন্ধকারে সিঁড়িতে অনেকক্ষণ ধরে উনি টাকাটা খুঁজছিলেন। এমন সময় অন্য একটি ভদ্রলোক ওকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি খুঁজছেন?

হঠাৎ হাত থেকে একটা টাকা পড়ে গেছে। তাই খুঁজছি।

পাবেন না। বাড়ি যান।

পাব না কেন?

আরে মশাই এ বাড়ির শুধু অফিসার আর কেরানীরা না, দরজা-জানলা-সিঁড়িও ঘুষ খায়।

কলকাতা কর্পোরেশনের গল্প শুনে আমরা হাসি।

রামজীবন বলে, কলকাতা কর্পোরেশনের সিঁড়ি তো এক টাকাতেই খুশী কিন্তু উদ্যোগ ভবনের সিঁড়ি তো এক বোতল স্কচ বা নিদেন পক্ষে একশ টাকার একটা নোট না পেলে খুশী হবে না।

আমরা আবার হাসি।

হাসবেন না দাদা। বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের মত লোক থাকলে এ যুগে আমাদের উদ্যোগ ভবন নিয়েই মহাকাব্য লেখা হতো। রবি ঠাকুর বা শরৎ চাটুজ্যেও যদি উদ্যোগ ভবনে কিছুকাল কাটাবার সুযোগ পেতেন তা হলেও হয়ত ভবিষ্যৎ বংশধররা কিছু জানতে পারত কিন্তু তাও হলো না।

ওর কথায় আমরা হাসি।

রামজীবনও হাসে। হাসতে হাসতেই বলে, শরৎচন্দ্রের সময় উদ্যোগ ভবন তৈরী হয় নি বলে উনি কিছু লিখতে পারেন নি কিন্তু তারাশঙ্কর যদি আরো কয়েক বছর আগে পার্লামেন্টে আসতেন তাহলেই দেখতেন শুধু দেশমুখ সাহেবকে নিয়েই আরোগ্য নিকেতন বা গণদেবতার মত একটা বিরাট উপন্যাস আমরা পেতাম।

কেষ্ট ঘোষ বললেন. তা বোধহয় পেতাম।

এর মধ্যে কোন বোধহয় নেই কেষ্টদা। সমুদ্রের জল যেমন নোনা হবেই, সেই রকম উদ্যোগ ভবনের মিনিস্টার আর বড় সাহেবদের কিছু রহস্য কিছু কাহিনী থাকবেই। তাছাড়া কত চক্রান্ত চলছে উদ্যোগ ভবনের ঘরে ঘরে।

তা ঠিক।

তাহলে আর কি চাই? অর্থ, নারী, সুরা, চক্রান্ত, রহস্য সব-কিছুই যখন আছে তখন উপন্যাস না হবার কোন কারণ নেই।

লাল শুড়কী দেওয়া উদ্যোগ ভবনের দীর্ঘ বিস্তীর্ণ চত্বর পার হচ্ছি। এখন মোটে দশটা দশ। অফিসের চেয়ার-টেবিল আলো করে আমরা আমলার দল এখনও বসি নি কিন্তু এরই মধ্যে পরিপাটি কোট প্যাণ্ট পরে হাতে সুন্দর সুন্দর ব্রীফকেস নিয়ে বিশ্বকর্মার বরপুত্ররা উদ্যোগ ভবন অভিযানে নেমে পড়েছেন। এরা দেওয়ালীর বকশিস, ক্রীষ্টমাসে কেক আর ফল, নিউ ইয়ার্সে ক্যালেণ্ডার-ডায়েরী, দুর্গাপূজার ব্রসয়োরে বিজ্ঞাপন দিয়ে উদ্যোগ ভবনের বন্ধুদের একেবারে বেলের মোরব্বার মত উপকারী করে রেখেছেন। রিসেপসন অফিসে এদের জন্য মুখের হাসি, গেটের পাহারাদারের সেলাম সব সময় মজুত আছে। মিঃ কুমার আমাদের ঘরে ঢুকলেই সেকসন অফিসার বলবেন, আরে তানিজা হু ইজ দিস ব্রাইট হ্যাণ্ডসাম ইয়াং ম্যান?

তানিজা হাসে। আমরা আরো অনেকে হাসি।

মিঃ কুমার লোকসভার স্পীকারের মত নীরবে মাথা নত করে আমাদের সবাইকে নমস্কার করে সেকসন অফিসারের সামনে হাত জোড় করে বলেন, বান্দাকে এভাবে কেন শাস্তি দিচ্ছেন স্যার? উনি একবার বিদ্যুৎ দৃষ্টিতে আমাদের টাইপিস্ট মিস রায়ের দিকে তাকিয়েই বললেন, সত্যি সত্যিই যদি ব্রাইট এ্যাণ্ড হ্যাণ্ডসাম ইয়াংম্যান হতাম তাহলে মিস রায় কী শনিবারেই আমার অর্ডারটা টাইপ করে দিতেন না?

মিস রায় মুখ টিপে টিপে হাসলেন। সেকসন অফিসার থেকে শুরু

করে আমরা সবাই চাপা হাসি হাসতে হাসতে মিস রায়কে দেখলাম। সেকসন অফিসারের টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে মিঃ কুমার বসতে না বসতেই মিস রায় সেকসন অফিসারকে একটা ফাইল দিয়ে এলেন। সেকসন অফিসার সঙ্গে সঙ্গে ফাইলটা খুলে মিঃ কুমারের সামনে ধরে বললেন, জাস্ট সী মিস রায় শনিবারেই সবকিছু টাইপ করে রেখেছেন।

মিঃ কুমার আনন্দে খুশীতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আই এ্যাম রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ মিস রয়।

টাইপ রাইটার থেকে মুহূর্তের জন্য হাসিমুখ তুলে মিস রায় শুধু বললেন, ধন্যবাদ।

মিঃ কুমার সেকসন অফিসারকে বললেন, এ রিপোর্ট সই হয়ে আমার অফিসে পৌঁছতে চার-পাঁচদিন তো লাগবেই বাট আই নীড ইট ইমিডিয়েটলি। এক্ষুনি এটাকে টেলেকস করে বোম্বে পাঠাতে হবে।

আমি এক্ষুনি একবার দেখে একটা কার্বন কপি আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি।

সো কাইণ্ড অফ ইউ স্যার।

উদ্যোগ ভবনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ঠিক হয়, বের করা হয় স্বার্থসিদ্ধির উপায়। মিঃ কুমার একটা বিখ্যাত ইলেকট্রনিকস ফার্মের দিল্লী ম্যানেজার। নিশ্চয়ই দু-তিন হাজার টাকা মাইনে পান। কনটপ্লেসে এয়ার-কণ্ডিসণ্ড ও কার্পেট মোড়া অফিস। হাজার দেড়েক টাকা ভাড়া দিয়ে গলফ লিঙ্কে থাকেন। কোম্পানীর কার্য-সিদ্ধিব জন্য ইনি অনেক কিছু করতে পারেন এবং করেন। করতেই হয়। ওবেরয়-অশোকা-ইম্পিরিয়্যালে দস্তখত করেই ইনি উদারভাবে অতিথি আপ্যায়ন করতে পারেন। অফিসের দুখানা গাড়ি ছাড়াও যখন ইচ্ছা টুরিস্ট ট্যাকসি ভাড়া করতে পারেন। প্রতি সপ্তাহে বাড়িতে ককটেল দিচ্ছেন। দরকার হলে বসন্ত বিহারের গেস্ট হাউসের দরজা খুলে দিতে পারেন কোম্পানীর স্বার্থে। কি পারেন না ইনি? মিঃ ভরদ্বাজের দুই ছেলে নাকি খুব ভাল ক্রিকেট খেলে অথচ টেস্ট ম্যাচ দেখার টিকিট পাচ্ছে না। মিঃ

কুমার ব্রীফকেস খুলে সঙ্গে সঙ্গে দুটো সীজন টিকিট দিয়ে দিলেন। কৃষ্ণমূর্তির মেয়ে ক্ল্যাসিক্যাল গানের ছাত্রী কিন্তু গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ে গিয়ে টিকিট কিনে কনফারেন্স এ্যাটেণ্ড করা তার পক্ষে খুবই কষ্টকর।

প্লীজ ডোণ্ট বদার মিঃ কৃষ্ণমূর্তি। আমি আমার অফিস থেকে কাউকে পাঠিয়ে টিকিট এনে আপনার বাড়ি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব।

ধর্ম-প্রাণ কৃষ্ণমূর্তি চন্দন লাগান ললাট কুঞ্চিত করে বললেন, আপনাকে অত কষ্ট করতে হবে না।

আমার স্ত্রীর জন্যও একটা টিকিট আনতে হবে। সুতরাং···

কুমার সাহেবের ফার্মকে যা তৈরী করার লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল তার চাইতে অনেক বেশী মাল ওরা তৈরী করে বাজারে ছেড়েছেন। এক কথায় অমার্জনীয় অপরাধ। ওসব অপরাধের জন্য কোম্পানীর সমস্ত লাইসেন্স বাতিল হবার নিয়ম ছিল। এখনও আছে। নিশ্চয় ভবিষ্যতেও থাকবে। উল্টোডাঙ্গা বা দমদমের সাধারণ কোন কোম্পানী এ অপরাধ করলে সে কোম্পানীর ঘটি-বাটি বিক্রী করে বড় কর্তাদের জেলে যেতে হতো কিন্তু মিঃ কুমারের কোম্পানীর কিছুই হলো না। দু বছর ধরে কুমার সাহেবের সেবা-যত্ন পাবার পর ভরদ্বাজ আর কৃষ্ণমূর্তি সরকারী নীতি বদলে দিলেন। লাইসেন্সের বেশী মাল তৈরী করা অপরাধ হয় কিন্তু বর্তমান অর্থ নৈতিক পরিস্থিতিতে এর ফল ভালই হবে।

অপোজিশন পার্টির লোকগুলো শুধু শুধুই চেঁচামিচি করে। ওরা বোধহয় ভারতীয় ঐতিহ্যের খবর রাখেন না। পুরুত ঠাকুরকে কিছু বেশী মালকড়ি দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলেই তো সব পাপ চলে যায়। ওরা বোধহয় জানেন না আমাদের উদ্যোগ ভবন সরকারী পুরুত ঠাকুরদের হেড কোয়ার্টার্স।

আমি সামান্য কেরানী। ডাক্তার এঞ্জিনিয়ার উকিল ব্যারিস্টার বা বড় বড় অফিসারদের মত আমাদের ঝুলিতে কিছু থাকার কথা নয় কিন্তু তবুও ঝুলি শূন্য থাকে না। নোংরা অন্ধকার ঘরে ভাঙা চেয়ার-

টেবিলে বসে কলম পিষতে পিষতেই কখনও কখনও মুখ তুলে দেখি। কখনও শুনি। আমি ক্লাবে যাই না, হোটেলে যাই না। এমন কী কনটপ্লেসের রেস্তোরাঁগুলোতেও যাবার অবকাশ বা সুযোগ আমার নেই। কুলু-মানালী বা ডালহৌসী-নৈনীতালে যেসব রসের মেলা বসে তা দেখার সৌভাগ্য আমার কোনদিনই হবে না। আমি লক্ষপতি-কোটিপতি নই যে মধুর লোভে মৌমাছি আমার চারপাশে উড়ে বেড়াবে। আমি এক তারিখে মাইনে পাবার আশায় মাসের কুড়ি তারিখ থেকে ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে থাকি। আজ পর্যন্ত পয়লা তারিখ অফিস যাই নি এমন ঘটনা ঘটে নি। পয়লা তারিখ রবিবার হলে মন খারাপ হয়ে যায়। গঙ্গা রোজগার করলেও দুশো টাকা ওর বাবা-মাকে পাঠায়। না পাঠিয়ে উপায় নেই। ওর স্কুল যাতায়াতের খরচ আছে টিফিনের খরচ আছে। তারপর শাড়ী ব্লাউজের জন্য একটু বেশী খরচ করতেই হয়। সাধারণ বাংলা স্কুল হলে বিশ-বাইশ টাকার তাঁতের শাড়ী পরেও যেতে পারতো কিন্তু ছোট্ট কিণ্ডার গার্টেন স্কুল হলেও আদব-কায়দা অন্য রকমের। ছোট্ট কচি বাচ্চাদেরও পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর টাকা মাইনে দিতে হয়। যাই হোক গঙ্গার হাতে বিশেষ কিছুই থাকে না। তবু মাসের শেষে ওর কাছে আমার হাত পাততেই হয়। এই তো দশটায় ঢুকছি। তবলার মত চাঁটি খেয়েই সারাটা দিন কাটবে আনন্দ নেই আত্মতৃপ্তি নেই, নেই অর্থ, নেই মর্যাদা তবু দাঁত বের করে হাসব। আমার মত অপদার্থ কেরানী হবার চাইতে বোধহয় সার্কাসের ক্লাউন হওয়াও ভাল ছিল কিন্তু উদ্যোগ ভবনের কেরানীরা বোধহয় কেরানী হবার জন্যই জন্মেছিল। পৃথিবীর এত বড় রঙ্গমঞ্চে আর কোথাও মৃত সৈনিক হবার যোগ্যতাও বোধহয় আমাদের নেই।

রামজীবন বলে আমরা সত্যি অনন্য। ইউনিক। আমাদের ভয় নেই ভীতি নেই দেশপ্রেম নেই বিদ্রোহ করার শক্তিও নেই।

কেশব দত্ত হাসে। আমি আসি। ইন্দুদাও হাসেন।

আপনারা হাসছেন কিন্তু বলুন ভারত সরকারের কেরানীরা যদি

সত্যিই অফিসার বা মন্ত্রীদের ভয় করত তাহলে কী দেশের হাল এই হতো ?…

আমি বললাম, ঠিক ভয় না করলেও গালাগালি তো খেতে হয়ই।

আমাদের কি মর্যাদাবোধ আছে যে গালাগালি শুনে তার প্রতিবাদ করব বা নিজের সংশোধন করব ?

ইন্দুদা বললেন, মর্যাদাবোধ থাকলে কী সরকারী আমলা হওয়া যায় ?

রামজীবন আবার বললো, শুধু তাই নয় ইন্দুদা, আমাদের যদি বিন্দুমাত্র দেশপ্রেম থাকতো তাহলে এই উদ্যোগ ভবনের কোন্ শালা অফিসার বা মন্ত্রী এক পয়সা ঘুষ খেতে পারতো বলুন তো ?

একটু করুণ হাসি হেসে ও বললো, আরে দুঃখের কথা কি জানেন ? আমরা পূজা প্যাণ্ডেলে ভিয়েতনাম নিয়ে নাটক করি কিন্তু স্ট্রাইকের দিন অফিস কামাই করার সাহস আমাদের নেই।

ইন্দুদা বললেন, তুমি জান রামজীবন, রেল স্ট্রাইকের সময় কাজ করে স্পেশ্যাল ইনক্রিমেণ্ট নেয় নি এমন বিপ্লবী রেলওয়ে বোর্ডের অফিসে পাবে না। তাছাড়া সরকারকে আনুগত্য দেখিয়ে কতজনে যে এই সুযোগে অপদার্থ ছেলেমেয়েকে রেলে ভর্তি করেছেন তার ঠিক ঠিকানা নেই।

রামজীবন একটু মুচকি হেসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো। বললো, সরকারী জুজুর ভয়ে দিল্লীর কেরানীরা নক্সাল মুভমেণ্টের সময় নিজের ছোট ভাই বা শালাকে পর্যন্ত বাড়িতে রাখতে ভয় পেয়েছে। অনেকে তাদের রিটার্ন টিকিট কেটে…

কেষ্টদা বললেন, আসলে আমরা সব সময় ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্সে ভুগি।

এসব ও আরো কত কথা ভাবতে ভাবতেই গেটের কাছে পৌঁছে গেছি। বুক পকেটে হাত দিয়ে আইডেনটিটি কার্ডটা একটু উঁচু করে সিকিউরিটি গার্ডকে দেখিয়েই উদ্যোগ ভবনের মধ্যে ঢুকলাম।

চার

ছোটখাট দোকানদাররা দোকান খুলেই দোকানদারি শুরু করতে পারে না। জিনিসপত্র বাক্স শো-কেস ঠিকঠাক করা ছাড়াও দোকান ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নেবার পরই এরা দোকানদারী শুরু করতে পারে। আমার মত আমলাদেরও একই অবস্থা। টেবিলের উপর শুধু কতকগুলো ফাইল পড়ে থাকে। আর কিছু না। যা কিছু দামী, যা হারিয়ে গেলে আমার ক্ষতি বা অসুবিধা হবে, তা সবই ড্রয়ারে বন্ধ থাকে। কালি, কলম, পেন্সিল, রবার, আলপিন, জেমস ক্লীপ, সাদা কাগজ আর একটা কাঁচের গেলাস। সরকারী অফিসের কেরানীদের কাছে এর প্রত্যেকটির মূল্য অনেক। মর্যাদাও যথেষ্ট। কেরানীগিরির চাকরিতে কৌলীন্য না থাকলেও ভাঙা বিবর্ণ টেবিলের উপর এগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেই আমরা ভঙ্গ কুলীন হবার চেষ্টা করি।

রোজ সকালে অফিসে এসে টেবিল সাজানই কেরানীবাবুদের প্রথম ও প্রধান কাজ। এই কাগজ-কলম-পেন্সিল ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে টেবিল সাজাতে সাজাতে আমার রোজ মনে হয় আমাদের বয়স হলেও আমাদের শৈশব উত্তীর্ণ হয় নি। ছোটবেলায় স্কুলের নিচু ক্লাশে পড়ার সময় সবাই টেবিল সাজিয়ে গৌরব বৃদ্ধি করে। পুরানো ক্যালেণ্ডারের ছবি দিয়ে বই-খাতায় মলাট দেওয়া, ডিজাইন করে স্কুল রুটিন তৈরী করা. ভাঙা ফ্রেমে জনপ্রিয় ফুটবল-ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ছবি বাঁধিয়ে টেবিলের কোণায় রাখা এবং এই সব ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে ভাই-বোনের প্রতিযোগিতা সব সংসারেই দেখা যাবে। আমরা শৈশবের সেসব সোনালী দিনগুলো বহুকাল আগেই হারিয়েছি কিন্তু তবুও মনে মনে আশেপাশের সহকর্মীদের চাইতে একটু বৈশিষ্ট্য দেখাতে চাই এই টেবিল সাজান-গোছান নিয়ে।

সরকারী অফিসে ঝাড়ুদার শুধু মেঝে ঝাড়ু দেয়। অফিস ঘরগুলোকে

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য আর কিছু করণীয় আছে বলে বড় কর্তারা মনে করেন না। কি বিচ্ছিরি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে যে আমরা কাজ করি তা বাইরের দুনিয়ার মানুষের পক্ষে কল্পনাতীত। ভারত সরকারের যাঁরা কর্ণধার, যাঁরা ভারতবর্ষের ষাট কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার গুরুদায়িত্ব নিয়েছেন তাঁদের বাস্তব জ্ঞান যে কত কম, সাধারণ মানুষ সম্পর্কে তাঁরা যে কত উদাসীন, তা যে কোন সরকারী অফিসে এলেই বুঝা যাবে। এরা কোটি কোটি টাকা দিয়ে সরকারী অফিস বিল্ডিং তৈরী করাবেন কিন্তু লক্ষ লক্ষ সরকারী কর্মচারীকে সুখ ও স্বস্তি দেবার জন্য এক টাকার নতুন ফার্নিচারও কিনবেন না। প্রত্যেকটি সরকারী অফিস ঘরেই হাজার হাজার ফাইল থাকে। থাকবেই। কিন্তু কোটি কোটি টাকা খরচ করে যে বাড়ি তৈরী হয়েছে ও হচ্ছে তার কোন ঘরেই ফাইলপত্র রাখার কোন ব্যবস্থা নেই। কাঠের র‍্যাকগুলো ফাইলের ভারে কাত হয়ে রয়েছে। হাত দিতে ভয় করে। তার উপর দিল্লীর ধুলো। বাপরে বাপ!

আমাদের ঘরগুলো দেখার পর যান মন্ত্রীর ঘরে। চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাবে। ঐ একখানা ঘরেই লাখ-টাকার কার্পেট সোফা চেয়ার-টেবিল। এখন তো বছর বছর মন্ত্রী বদল হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে মন্ত্রীর ঘর। পিঙ্ক কলারের কার্পেট? ছি-ছিঃ চেঞ্জ ইট। কি কলারের হবে স্যার? অলিভ গ্রীণ। বদলাও সোফা, বদলাও চেয়ার-টেবিল। ঘরের রং বদলাও। এ ধরনের আলো, পর্দাও মন্ত্রীর পছন্দ নয়। জয়েন্ট সেক্রেটারী নতুন মন্ত্রীকে খুশী করার জন্য বললেন, স্যার, হাউ ডু ইউ লাইক স্যার। যদি টিক প্যানেলিং করে দিই?

আমাদের বাস্তববাদী প্রগতিশীল মন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, তা করতে পারেন।

যে ভাবেই হোক নতুন মন্ত্রী প্রমাণ করবেন আগের মন্ত্রীর রুচি ছিল না, অভাব ছিল ব্যক্তিত্বের। আমাদের চোখের সামনে দিয়ে রুচিবান মন্ত্রীর পছন্দমত চেয়ার-টেবিল-কার্পেট-সোফা যায় কিন্তু মনে

মনে বলি, মিনিস্টার সাহেব, উদ্যোগ ভবনের রঙ্গমঞ্চে আপনাদের মেয়াদ তো বেশী দিনের হয় না। নতুন মন্ত্রী তো আপনার স্পর্শ করা একটা জিনিসও ব্যবহার করবেন না। তিনিও আপনার রুচি দেখে মুচকি হেসে জয়েণ্ট সেক্রেটারীকে বলবেন, এ ঘরে বসে আমার পক্ষে কাজ করা অসম্ভব। জয়েণ্ট সেক্রেটারী সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, আমি জানতাম স্যার, আপনার মত রুচিবান লোকের পক্ষে এ ঘরে কাজ করা অসম্ভব।

যে অর্থ দিয়ে আমাদের মিনিস্টার সাহেবের ঘর সাজান হয় তা দিয়ে দিল্লী-কলকাতার মত মহানগরীতেও একটা দোতলা বাড়ি তৈরী করা যায়। মন্ত্রীর মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্যই বিশ-পঁচিশ হাজার টাকার এয়ার কণ্ডিসনার বসান আছে। অথচ এরাই নাকি গরীব মানুষের দুঃখে কাতর হয়ে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ!

চমৎকার! পাশের ঘরের কেরানী কিভাবে দিন কাটান তা যাঁরা জানেন না তাঁরাই আবার সমাজতন্ত্রের বুলি আওড়ান। মন্ত্রীর ঘরে আমি বা আমাদের মত হতভাগ্য কেরানীদের প্রবেশ নিষেধ কিন্তু সব খবরই আমাদের কানে আসে। এই তো ইদানীং কালেই আমাদের এক প্রগ্রেসিভ মন্ত্রী অফিস ঘরের মধ্যে শাওয়ার ফিট-করা চমৎকার বাথরুম তৈরী করিয়েছেন। মিনিস্টাররা নিজেদের খুব চালাক মনে করেন। ভাবেন ওদের এসব কীর্তিকাহিনী আমরা কেরানীরা জানতে পারি না। পারব না। আমরা সব খবর জানি। আফিসের খবর ছাড়াও মন্ত্রীদের বাড়ির খবর পর্যন্ত আমরা জানতে পারি। কোন মন্ত্রীর সঙ্গে বোম্বের বিখ্যাত ফিল্ম অ্যাকট্রেসের ভাব, কোন মন্ত্রীর বাগানের আলু প্রাইভেট সেক্রেটারী বিক্রি করে দিয়েছে, কোন মিনিস্টারের ছেলে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি করার জন্য কি কাণ্ড করেছেন—সব আমরা জানি। দুদিন আগে বা দু দিন পরে। বরং মন্ত্রীরাই আমাদের খবর রাখেন না। আমাদের সুখ-দুঃখ, চুরি-জোচ্চুরি বা ফাঁকি দেবার কোন খবরই ওঁরা রাখেন না।

সাধারণ মানুষদের সম্পর্কে ঔদাসীন্য দেখানই বোধহয় ভারতীয় নেতাদের মহত্ব!

এতকাল উদ্যোগ ভবনে চাকরি করছি কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন মন্ত্রী তো দূরের কথা, কোন ডেপুটি সেক্রেটারীও আমাদের ঘরগুলো দেখতে আসেন নি। রোজ সকালে টেবিল সাজাতে গেলেই মেজাজ খারাপ হয়। এই পরিবেশে কি কারুর কাজ করতে মন লাগে? প্রাইভেট ফার্মের লোকগুলো কেন কাজ করবে না? চেয়ার-টেবিল ঘরদোর চকচক ঝকঝক করে। কাগজপত্র ফাইল রাখার কি সুন্দর ব্যবস্থা! কাজ না করে উপায় নেই। প্রাইভেট ফার্মের কেরানীরা তো বিদ্যাসাগর নয়। তারাও তো আমাদেরই মত সাধারণ লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়ে।

আমাদের ঘরের টেবিল দেখেই বুঝবেন কে আমাদের বড়বাবু! সেকসন অফিসার। ভারত সরকারের গেজেটে এঁর নাম ছাপা হয় বলে এঁর টেবিলটা একটু বড়। সারা ঘরের কেরানীদের উপর মাতব্বরী করার জন্য টেবিলটা একটু বাঁকানো। টেবিলের একপাশে টেলিফোন ছাড়াও ফাইলের আগমন ও নির্গমনের জন্য দুটি ট্রে। আমরা কাজকর্ম করে ডানদিকের ট্রেতে ফাইল রাখি। বড়বাবু ফাইলটার উপর একবার চোখ বুলিয়েই ফাইলের নীচে বাঁদিকে ছোট্ট সই করে বাঁদিকের ট্রেতে রাখেন। বড় বড় অফিসার আর মন্ত্রীরাই শুধু সরকারী ফাইলের ডানদিকে সই করার অধিকারী। গণতান্ত্রিক দেশের সরকারী অফিসে আরো কত নিয়ম-কানুন! রেলওয়ে বোর্ডের মেম্বাররা সাদা কাগজে সই করেন না। তারা শুধু সবুজ কাগজেই সই করেন!

যাগকে এসব! প্রথম প্রথম চাকরিতে ঢুকে এসব দেখে ও শুনে অবাক লাগত। এখন সহ্য হয়ে গেছে। এখন যদি আমাকে একটা ভাল চেয়ার-টেবিল দেওয়া হয় তাহলেই বরং অস্বস্তি বোধ করব। যদি সকালে এসে দেখি আমাদের অফিস ঘর ঝকঝক-তকতক করছে, কেউ আমার টেবিল সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছে তাহলে

সত্যি ঘাবড়ে যাব। উপেক্ষিত আর অপমানিত হবার জন্যই তো সরকারী আমলা হয়েছি। বছর বছর দু-পাঁচ টাকা ডিয়ারনেস এলাউন্স বাড়িয়ে দেওয়া ছাড়া সরকারের কাছে আর কোন প্রত্যাশা আমাদের নেই।

টেবিল সাজিয়ে বসতে না বসতেই চারমিনার টানতে টানতে কেষ্ট ঘোষ হাজির। সেকসন অফিসার সাহেবকে সেলাম করেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমার পাশে বসল। হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, কিগো আজ এত সকাল সকাল আমাকে দেখতে এলে?

শুধু তোর জন্যই আজ অফিসে এলাম।

কেন গুল মারছ?

সত্যি বলছি তোর জন্য এসেছি। তা নয়ত আজ ডুব মারতাম।

আমি চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, টাকা চাই?

কেষ্ট ঘোষ চারমিনারে টান দিয়ে বললো, না, তোর বউকে চাই।

কেষ্ট ঘোষ নাটক করে। যৌবনে যখন গোল মার্কেট পাড়ায় থাকত তখন ও সব নাটকেই হিরো হতো। শুনেছি সিরাজদ্দৌল্লার ভূমিকায় একবার ওর অভিনয় দেখে স্বয়ং নির্মলেন্দু লাহিড়ী পর্যন্ত প্রশংসা না করে পারেন নি। আমি বরাবরই সিনেমা দেখতে ভালবাসি। থিয়েটারে একটুও আমার আগ্রহ নেই বলে কেষ্ট ঘোষের অভিনয় আমি দেখি নি। এখন ওর বয়স হয়েছে, পেটের গোলমালের জন্য চেহারাটাও খারাপ হয়েছে। তাই অভিনয় করা ছেড়ে দিয়েছে। তবে নাটক পরিচালনা করে। পরিচালক হিসাবেও দিল্লীর বাঙালী মহলে কেষ্ট ঘোষের বেশ সুনাম। বছরে দু-তিনটে নাটক পরিচালনা করে বহু ডায়ালগ ওর মুখস্থ। তাই ভাবলাম সকালবেলাতেই থিয়েটারী ডায়ালগ আওড়াচ্ছে। হাসতে হাসতে বললাম, আমার কাছে চাইলে কি আমার বউ পাওয়া যায়?

আমি না বলে তো কারুর বউ-মেয়ে নিই না। তাছাড়া নিলেও বেশীদিন নিজের কাছে রাখি না। নাটক হয়ে গেলেই ফিরিয়ে দিই।

এতক্ষণে বুঝলাম। বললাম, কিন্তু ভাই আমার বউ তো অভিনয় টভিনয় করে না।

এখন না করলেও ছোটবেলায় তো করেছে। তাছাড়া আমি ঠিক তৈরী করে নেব। চারমিনারে একটা টান দিতে গিয়েও কেষ্ট ঘোষ থামল। বললো, তুই না বাঁচালে আমি ডুবেছি।

কেন?

মিসেস নাগ করছিলেন কিন্তু ওঁর মা মারা যাওয়ায় উনি আজ কালকা মেলেই কলকাতা চলে গেলেন। অথচ হাতে মাত্র দু সপ্তাহ সময়।

আর কেউ নেই?

আর একটি মেয়ে ছিল কিন্তু সামনের মাসেই তার এম-এ পরীক্ষা।

কেষ্ট ঘোষ জানে নাটকের ব্যাপারে আমার উৎসাহ বা ঔদাসীন্য কোন কিছুই নেই। তাই আমাকে ভাবতে দেখে বললো, তুই আজ বাড়ি গিয়ে বউয়ের সঙ্গে পরামর্শ কর। আমি নটা-সাড়ে নটা নাগাদ আসব।

শুধু জিজ্ঞাসা করলাম, কি বই হচ্ছে?

শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ।

ও পারবে কিনা জানি না, তবে তুই যখন বলছিস তখন জিজ্ঞাসা করব।

মানে তুই আমার হয়ে একটু সুপারিশ করিস।

সন্ধ্যার পর অফিস থেকে ফিরে চা খেতে খেতেই জিজ্ঞাসা করলাম, গঙ্গা, অভিনয় করবে?

গঙ্গা অবাক হয়ে বললো, হঠাৎ?

বল না করবে কিনা? আজ রাত্রেই ডিরেক্টর সাহেব আসবেন।

কি ব্যাপার বলতো।

আজ অফিসে ঢুকতে-না-ঢুকতেই কেষ্ট ঘোষ এসে হাজির। ওর হিরোইনের মা মারা গেছে বলে....

গঙ্গা হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের ঐ কেষ্ট ঘোষ হিরো নাকি ?

না, না, ও ডিরেক্টর।

তাই বল।

আমাকে ভীষণভাবে ধরেছে তোমাকে রাজী করবার জন্য।

তুমি কথা দিয়েছ নাকি ?

তোমাকে জিজ্ঞাসা না করেই আমি কথা দেব ?

গঙ্গা চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বললো, ছোটবেলায় করেছি ঠিকই কিন্তু এখন আর আমার দ্বারা ওসব হবে না।

আমি বললাম, কিন্তু কেষ্ট যেভাবে ধরেছে তাতে ছাড়বে বলে মনে হয় না।

উনি ধরেছেন বলেই কি আমাকে এই বুড়ো বয়সে থিয়েটারে নামতে হবে ?

কি বললে ?

শুনতে পাওনি ?

শুনেছি কিন্তু অবিশ্বাস্য মনে হলো।

আমার চাপা হাসি আর চোখের চাহনি দেখেই গঙ্গা হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি ধারণা আমি কচি খুকী ?

মাথা খারাপ ?

তবে ?

কচি খুকী হলে কি তোমার জন্য আমার এমন নেশা হয় ?

বাজে বকো না।

গঙ্গা, দুজনেরই খালি কাপে আবার টি-পট থেকে চা ঢেলে আমাকে এক কাপ এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আমার দিকে তাকিয়ে হাসছ কেন ?

ভাবছি তোমার মত নায়িকা পেলে বোধহয় আমিও অভিনয় করতে পারি।

অভিনয় করেই তো তুমি আমাকে ভুলিয়েছ। আসলে সব পুরুষই অল্পবিস্তর অভিনয় করে।

গঙ্গা, হনুমানের মত যদি বুক চিরে দেখাতে পারতাম তাহলে দেখতে তুমি ছাড়া ভিতরে আর কিছু নেই।

তাই নাকি?

আমি চুপ করে চা খাই। গঙ্গা বললো, যাকে এত ভালবাস তাকে অন্য পুরুষের সঙ্গে অভিনয় করতে বলছ কিভাবে?

আমি তো বলছি না।

তবে কি আমি বলছি?

কেষ্ট ঘোষ বলেছে বলে আমি তোমাকে তোমার মতামত জানাতে বললাম।

তুমি ওকে বলে দিও আমার দ্বারা ওসব হবে না। এখন স্টেজে নেমে ন্যাকামী করা সম্ভব নয়।

আমি হাসি।

হাসছ যে। আমি সিরিয়াসলি বলছি আমার দ্বারা থিয়েটার করা হবে না।

ঠিক আছে। উনি এলে তুমি বলে দিও।

না, না, আমি কিছু বলতে পারব না। তুমিই বলে দিও।

তা তো বলব কিন্তু ও যা নাছোড়বান্দা লোক····

আসল কথা থিয়েটারের লোকগুলোকেই আমার ভাল লাগে না।

কেন?

থিয়েটারের লোকগুলো কেমন গায়পড়া হয়।

তার মানে?

তার মানে মেয়েদের ব্যাপারে একটু হ্যাংলামী থাকে।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আর যেই হোক কেষ্টদা তোমাকে দেখে হ্যাংলামী করবেন না।

শুধু কেষ্টদাকে নিয়েই তো থিয়েটার হবে না। তাছাড়া থিয়েটারের

লোকগুলোকে শুধ্ থিয়েটারের সময়ই চেনা যায়। উইংগস্-এর পাশের অন্ধকারেই ওদের আসল রূপ দেখা যায়।

আমি থিয়েটার করি নি। থিয়েটারের ব্যাপারে আমার কোন অভিজ্ঞতা বা আগ্রহই নেই। চুপ করে থাকি।

গঙ্গা জিজ্ঞাসা করল, আমার কথাটা বোধহয় তোমার ভাল লাগল না, তাই না?

আমার ভাল না লাগার কি আছে! তাছাড়া থিয়েটারের ব্যাপারে আমার কোন অভিজ্ঞতাই নেই।

গঙ্গা আর কিছু বললো না। চুপ করে উঠে গেল। আমি বুঝলাম, ও কেষ্ট ঘোষের অনুরোধ রাখবে না। থিয়েটার করার ব্যাপারে ওর বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা উৎসাহ নেই।

সাড়ে আটটা বাজতে বাজতেই কেষ্ট আসাতে বুঝলাম ও সত্যি বিপদগ্রস্ত। সঙ্গে আরো দু-চারজন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে বাইরের ঘরে বসতেই বললাম, নারে ও রাজী হচ্ছে না।

কেন?

বললো এখন আর ওর দ্বারা হবে না।

কে বললো হবে না? গত বছর আমি আমার ছোট মাসীকে দিয়ে রানী রাসমণির পার্ট করিয়ে ছাড়লাম। যারা মলিনায় অভিনয় দেখেছে তারা পর্যন্ত....

কেষ্টর সঙ্গে ইন্দুদার ভাগনে অজয় এসেছিল। ও কেষ্টকে পুরো কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বললো, সত্যি সোমনাথদা, আপনি ভাবতে পারবেন না মাসী কি দারুণ অভিনয় করেছিলেন। কেষ্টদার হাতে পড়লে অভিনয় ভাল না হয়ে উপায় আছে?

কেষ্ট বললো, তুই বিশ্বাস কর সোমনাথ, এই রকমই বিপদে পড়ে যখন মাসীকে ধরলাম, তখন মাসী আর মেসো আমাকে শুধ্ মারতে বাকি রেখেছিলেন।....

মাসীর রেগে যাবারই কথা। বয়স প্রায় ষাট। নাতি-নাতনী পর্যন্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া অত্যন্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে

ও বউ। স্কুল-কলেজে কোনদিন যান নি। বাড়িতেই সামান্য লেখা-পড়া শিখেই শিয়ালদ' স্টেশনের বুকিং ক্লার্ক ব্রজেন মিত্তিরের গলায় মালা পরিয়ে দেন। মাসীর যেটুকু বুদ্ধি ছিল তা মেসোর জন্য আলু-পোস্ত রান্না করেই শেষ হয়েছে। তবে রেলের বাবুকে বিয়ে করার জন্য মাসী খুব বেড়িয়েছেন। উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র। এমন কী যেখানে রেলের পাশ দেখিয়ে যাওয়া যায় না, সেরকম জায়গাও মাসী গিয়েছেন। বাবা কেদারনাথ-বদ্রীনাথ দর্শনও হয়ে গেছে। এর পর অভিনয়? রঙ-চঙ মেখে স্টেজে উঠতে হবে? মাসী তো হেসেই আটখান। হাসি থামলে বললেন, কথায় বলে দাঁড়িকে মাঝি করা, মাঝ গাঙে ডুবে মরা। তা আমাকে স্টেজে নামালে তোর এই অবস্থাই হবে। কেষ্ট তবু নাছোড়বান্দা, তুমি কিছু চিন্তা করো না মাসী। আমিও ডুববো না, তুমিও ডুববে না।

সত্যি দুজনের কেউই ডুবলেন না। বরং দুজনেই সসম্মানে উতরে গেলেন।

গুপী বললো, আগে থেকে বুঝা যায় না কার মধ্যে অভিনয় ক্ষমতা আছে। শিখাদির মত মেয়ে যে কোনদিন চন্দ্রমুখীর ভূমিকায় অভিনয় করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবেন তা কেষ্টদাও স্বপ্নে ভাবতে পারেন নি।

কেষ্ট বললো, বিশেষ করে ওর মত লাজুক মেয়ে যে কিভাবে অত ভাল অভিনয় করল তা এখনও আমি বুঝতে পারলাম না।

অজয় বললো, মজার কথা কি জানেন সোমনাথদা, শিখাদি নিজের স্বামীর অপোজিটে অভিনয় করতে রাজী হলেন না।

কেন?

বললেন, ওকে দেখলেই হাসি পাবে। তাইতো আমাকে ধর্মদাসের বদলে দেবদাস হতে হলো।

এইসব কথাবার্তা বলাবলি করতে করতেই গঙ্গা সবার চা নিয়ে এলো। কেষ্ট ওর কাছ থেকে চায়ের কাপটা হাতে নিতে নিতেই বললো, আপনি কি আমায় বাঁচাবেন না?

জনে জনের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিতে দিতে গঙ্গা বললো, ওভাবে কেন বলছেন দাদা? বিয়ের বহু আগে থেকেই এসব ছেড়ে দিয়েছি।

কেষ্ট বললো, সেজন্য আপনি ভাবছেন কেন? আপনি দয়া করে রাজী হলেই....

কেষ্টকে ঐভাবে কথা বলতে শুনে আমি বললাম, দয়ার কি আছে? ওর অভ্যেস নেই বলেই রাজী হচ্ছে না।

গঙ্গা বললো, সত্যি দাদা, স্টেজে উঠে আমি বোধহয় একটা কথাও বলতে পারব না।

কেষ্ট নাছোড়বান্দা, গঙ্গাও রাজী হতে চায় না। একে অনভ্যাস, তারপর সংসার ও স্কুলের কথা বললো। একবার আমি বললাম দিল্লীতে হিরোইনের এত অভাব তা তো জানতাম না।

অভাব আছে তা বলব না। তবে সবসময় হাতের কাছে ফিমেল আর্টিস্ট পাওয়া যায় না। আফটার অল ওদের তো সংসার ধর্ম আছে।

গুপী বললো, তাছাড়া মেয়েরাও হয় পড়াশুনা করে, নয়ত কোন না কোন চাকরি তো করবেনই।

কেষ্ট বললো, একদিন-দুদিনের জন্য অভিনয় করতে অনেক মেয়েই প্রস্তুত কিন্তু সমস্যা হচ্ছে রিহার্সাল দেবার। সংসার ফেলে রেগুলার রিহার্সাল দেওয়াই ওদের সব চাইতে বড় সমস্যা।

অজয় গঙ্গাকে বললো, আপনার পক্ষে তো রিহার্সাল দেওয়া বিশেষ অসুবিধা হবে না।

কেন? গঙ্গা জানতে চাইল।

হাজার হোক শুধু তো মিয়া-বিবির সংসার!

মিয়া-বিবির সংসার বলে কি আমার কাজ নেই? নাকি আমাদের খিদে লাগে না?

না, না, তা বলছি না। বলছি ঝামেলা তো কম।

গঙ্গা একটু হেসে বললো, ঝামেলা কম! এমন স্বামী সামলানোর চাইতে দশটা বাচ্চা সামলানো অনেক সহজ।

ওর কথায় আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

কেষ্ট বললো, ও যাতে ঝামেলা না করতে পারে তার জন্য ওকেও না হয় একটা রোল দিয়ে দেব।

আমি হাত জোড় করে বললাম, দোহাই বাবা। আমি মরে গেলেও থিয়েটার-টিয়েটার করতে পারব না।

যাই হোক দেড়-ঘু ঘন্টা আলাপ-আলোচনা চলার পর গঙ্গা রাজী না হয়ে পারল না। এত অনুরোধ-উপরোধের পরও রাজী না হলে আমারও খারাপ লাগতো।

কেষ্ট খুব জোরে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললো, আপনি আমাকে বাঁচালেন। আপনি রাজী না হলে আমি যে কি করতাম তা আমি....

গঙ্গা বললো, আমি রাজী না হলেও অন্য কেউ নিশ্চয়ই রাজী হতেন।

অজয় বললো, ব্যাঙের ছাতার মত এত থিয়েটার গ্রূপ দিল্লীতে গজিয়ে উঠেছে যে এই বাজারে চাকরি পাওয়া বরং সম্ভব কিন্তু পছন্দমত নায়িকা পাওয়া সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার।

গঙ্গা হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, নায়কের বুঝি ছড়াছড়ি?

কেষ্ট বললো, অনেকেই তো নায়ক হতে চায় কিন্তু ভাল নায়ক পাওয়াও বেশ কঠিন।

গঙ্গা জানতে চাইল, আমার অপোজিটে কে অভিনয় করবেন?

এই তো অজয়।

অজয় আর গঙ্গার একবার সলজ্জ দৃষ্টি বিনিময় হলো।

কেষ্ট বললো, কিরে সোমনাথ তোর স্ত্রী আর এক রাউণ্ড চা খাওয়াবেন নাকি?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, গঙ্গা এমন হিরোইন নয় যে ডিরেক্টরের কথা শুনবে না।

আবার চা হলো। সবাই মিলে চা খেলাম। একে একে ওরা বিদায় নিল আমার কাছ থেকে, গঙ্গার কাছ থেকে। সব

শেষে অজয়। গঙ্গার সামনে হাত জোড় করে নমস্কার করে বললো, চলি রমা!

গঙ্গা হাসতে হাসতে কেষ্টকে বললো, অজয়বাবু এখনই যদি রমেশ হয়ে যান তাহলে কি ওকে আমি সামলাতে পারব?

আঃ! অজয়, ওভার এ্যাকটিং করো না।

বিশেষ সময় ছিল না বলে পরের দিন থেকেই রিহার্সাল শুরু হলো, আমি অফিস থেকে ফেরার পর আমাকে চা-জলখাবার দিয়েই গঙ্গা চলে যায়। যাবার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি আমাকে আনতে যাবে?

কেন, আমার যাবার কি দরকার?

তুমি গেলে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারি।

যাওয়া মানেই তো ঘণ্টাখানেক বাস ঠাঙানো নয়ত নগদ পাঁচটা টাকা....

ওরাই তো স্কুটার ভাড়া দিয়ে দেবে।

ওদের কাছ থেকে তুমি স্কুটার ভাড়া নিতে পারো কিন্তু আমার পক্ষে তো তা সম্ভব নয়।

ওদের ভরসায় থাকার জন্য আমার আসতে আরো দেরী হয়ে যায়।

কেন?

রিহার্সাল শেষ হবার পর কিছুক্ষণ আড্ডা না দিয়ে তো কেউ নড়বে না। তাছাড়া কেষ্টদার বাড়ি থেকে বেশ কিছুদূর না গেলে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না।

যারা থিয়েটার করছে তাদের কারুর স্কুটার নেই।

তা থাকবে না কেন?

তাহলে ওরাই তো একজন তোমাকে পৌঁছে দিতে পারে।

কিন্তু

কিন্তু কি?

আমি কাকে বলব?

তুমি কেষ্টকে বলো। তাহলেই ও কাউকে বলে দেবে।

গঙ্গা আর দেরী করে না। চলে যায়। আমিও জামা-প্যান্ট বদলে খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে একটু শুয়ে পড়ি। কোনদিন বন্ধুবান্ধব এলে একটু গল্পগুজব করি। হয়ত বা বাজারে যাই। সাড়ে আটটা-নটার মধ্যেই গঙ্গা ফিরে আসে। কেউ না কেউ ওকে পৌঁছে দিয়ে যায়। হয় ট্যাক্সিতে, না হয় স্কুটারে। শনিবার-রবিবার একটু বেশী সময় রিহার্সাল হয়।

সেদিনও কি কারণে যেন ছুটি ছিল। বিকেল চারটে থেকে রিহার্সাল ছিল। গঙ্গা একাই গেল কিন্তু ফিরল অজয়ের স্কুটারে। গঙ্গা ঘরে ঢুকেই বললো, এত স্পীডে স্কুটার চালালে জীবনেও আপনার স্কুটার চড়ছি না।

আমি অজয়কে জিজ্ঞাসা করলাম, খুব স্পীডে এসেছ বুঝি ?

না, না। বড় জোর পঞ্চাশ কিলোমিটার

গঙ্গা প্রতিবাদ করল, বাজে বকবেন না। ঐ আপনার পঞ্চাশ কিলো-মিটার স্পীড ? কতবার আমি পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছি জানেন ?

অজয় হাসে। একবার আমার দিকে তাকিয়ে গঙ্গাকে বললো, এখন আপনাকে ফেলে দিলে কেষ্টদা আমাকে খুন করবেন, তা জানেন।

সে তো পরের কথা কিন্তু তার আগে তো আমি হাসপাতালের মর্গে পৌঁছে যাবো।

ওর কথায় আমরা হাসি। ভিতরে যেতে যেতে গঙ্গা বললো, বসুন। চা খেয়ে যাবেন।

এত রাত্রে আর চা খাব না।

আমি বললাম, কষ্ট করে যখন এসেছ তখন এক কাপ চা খেয়েই যাও।

অজয় বসল। একটু পরেই গঙ্গা চা নিয়ে এলো। তিনজনে চা খেতে খেতে একটু গল্পগুজব হলো। তারপর অজয় চলে গেল।

এমনিভাবেই রিহার্সালের দিনগুলো শেষ হলো। নাটক হবার

আগের দিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে গঙ্গা বললো, কাল স্টেজে নেমে কি করব তা ভেবে পাচ্ছি না।

এত ভয়ের কি আছে? তাছাড়া রিহার্সাল তো ভালই হয়েছে বলছিলে।

রিহার্সাল ভাল হলেই যে স্টেজে ভাল করতে পারব তার তো কোন ঠিক নেই।

কিচ্ছু ঘাবড়িও না: সব ঠিক হয়ে যাবে।

তুমি যাবে তো? নাকি....

আমি হাসতে হাসতে বললাম, তুমি পর পুরুষের সঙ্গে প্রেম করবে আর আমি সে দৃশ্য দেখব না?

এইসব বাজে কথা বললে আমি নিজেই যাব না।

আমি আর কোন কথা না বলে ওকে কাছে টেনে নিলাম।

আমি থিয়েটার দেখতে যাই না কিন্তু কেষ্টদের থিয়েটার না দেখে পারি নি। হাজার হোক বউ যখন নায়িকার ভূমিকায় নেমেছে তখন না দেখে উপায় আছে?

থিয়েটার শুরুর একটু আগেই আইফ্যাকস হলে পৌঁছলেও এদিক-ওদিক ঘুরাঘুরি করছিলাম। নায়িকার স্বামীকে এভাবে ঘুরতে দেখে কেষ্টকে খবর দিয়েছিল। ও এসে জোর করে আমাকে একেবারে গ্রীন রুমে নিয়ে গঙ্গার সামনে হাজির করল। বললো, দাঁড়া, চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আমি বললাম, এখানে চা খাব কেন?

তাতে কি হলো? এক্ষুনি চা আসছে। কেষ্ট খুব ব্যস্ত। সারা মুখে ক্লান্তির ছাপ। তবুও একটু হেসে বললো, তোর গিন্নীর অভিনয় দেখে তুইই অবাক হয়ে যাবি।

আমিও হাসতে হাসতে জবাব দিলাম, ওর অভিনয় তো এই সাত বছর ধরেই দেখছি।

গঙ্গা মেক আপ নিতে নিতেই হাসল। যিনি মেক-আপ

দিচ্ছিলেন তিনিও হাসলেন। কেষ্ট হাসতে হাসতেই আমাকে শাসন করল, আমার হিরোইনের নিন্দা করলে মার খাবি।

একটু পরেই এক বড় কেটলি চা আর ডজন খানেক খালি কাপ নিয়ে একটা ছেলে এসে আমাদের সবাইকে চা দিল। চা খেলাম। চা খেয়েই উঠলাম। গঙ্গা বললো, শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি এখানে চলে এসো। দেরী করো না।

দোতলার গ্রীনরুম থেকে নীচে নামার জন্য এক পা ফেলতেই গঙ্গা ডাকল, পিছিয়ে গেলাম। ও মেক-আপ নিতে নিতেই হ্যাণ্ড ব্যাগটা এগিয়ে দিয়ে বললো, এটা তোমার কাছে রেখে দাও তো।

লেডিজ হ্যাণ্ড ব্যাগ নিয়ে আমি কিভাবে....

কেষ্ট গঙ্গাকে বললো, ওটা আপনার কাছেই রাখুন। যখন স্টেজে ঢুকবেন তখন আমাকে দিয়ে যাবেন।

আমি নীচে এলাম। হলের সামনে আপন মনে ঘুরাঘুরি করতে করতে গঙ্গার মেক-আপ নেবার দৃশ্যটাই বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। যে মেক-আপ দিচ্ছিল তার বয়স বেশী নয়। বোধহয় পঁচিশ-ছাব্বিশ। ও যেভাবে গঙ্গার মুখে আর গলায় পেন্ট করছিল তা বোধহয় আমিও সবার সামনে পারতাম না। লজ্জা করত। গঙ্গার বয়স একত্রিশ হলেও চব্বিশ-পঁচিশ বছরের বহু মেয়ের চাইতে ওর চেহারা ভাল আছে। তারপর ছেলেমেয়ে হয় নি! সেই গঙ্গার মুখে, গলায়, গলার নীচে যেভাবে রং মাখাচ্ছিল তা দেখে কেমন যেন লাগল। আবার ভাবলাম অভিনয় করতে হলে মেক-আপ তো নিতেই হবে। তাছাড়া যে ছেলেটা মেক-আপ দিচ্ছিল, সে ওর চাইতে বয়সে ছোট ও কেষ্টরই কোন বন্ধুর ছেলে বা ভাইপো হবে। সুতরাং এ নিয়ে এত ভাববার কি আছে? তবু গঙ্গা তো শুধু আমারই গঙ্গা! যার দেহের উত্তাপ আমার মনে সব দাহ দূর করে, কেরানী জীবনের সমস্ত গ্লানি ও ব্যর্থতা ঘুচিয়ে দেয় তার অঙ্গে অন্য যদি কেউ হাত দেয় এমন প্রকাশ্যে প্রাণভরে হাত দেয়, তাহলে মনের মধ্যে একটু খচ্ খচ্ করবে না?

কেষ্ট ঘোষ পরিচালিত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পল্লীসমাজ অভিনয় দেখলাম। আগাগোড়া দেখলাম। মুগ্ধ হয়ে গেলাম রমার ভূমিকায় গঙ্গার অভিনয় দেখে। শেষ দৃশ্যে রমা রমেশকে দুটি অনুরোধ জানাবার পর যখন বললো, রমেশদা, আমি যতীনকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। তাকে তোমার মতো করে মানুষ করো। বড় হয়ে সে যেন তোমার মতোই হাসিমুখে স্বার্থত্যাগ করতে পারে, তখন রমেশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দর্শক চোখের জল না ফেলে পারেন নি। আমিও চোখের জল ফেলেছিলাম। রমাকে নিয়ে বিশ্বেশ্বরী চলে গেলেন। লক্ষ কোটি মানুষের এই পৃথিবীতে রমেশ নিঃসঙ্গতার অসহ্য জ্বালা বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই আস্তে আস্তে ড্রপ পড়ল।

অডিটোরিয়াম আর স্টেজের সব আলো জ্বলে উঠল। কেষ্ট ঘোষ সমস্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের নিয়ে স্টেজের উপর লাইন করে দাঁড়াতেই দর্শকদের অভিনন্দনের ঝড় বয়ে গেল। হাততালি থামলে কেষ্ট ঘোষ মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, একটি ছোট্ট ঘোষণা না করে পারছি না। রমার ভূমিকায় যিনি অভিনয় করছিলেন, মা মারা যাবার জন্য তিনি হঠাৎ কলকাতায় চলে যান। আজকে রমার ভূমিকায় অভিনয় করলেন শ্রীমতী গঙ্গা সরকার এবং মাত্র বারো দিন রিহার্সাল দিয়ে আজ অভিনয় করলেন বলে···

কেষ্টর ঘোষণা শেষ হবার আগেই সমস্ত দর্শকরা হাততালি দিয়ে গঙ্গাকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাবার সময় সত্যি গর্বে আমার বুকখানা ভরে গেল। ভুলে গেলাম মেক-আপ দেবার কথা।

দর্শকদের ভীড় পাতলা হতে শুরু করলে কেষ্ট স্টেজ থেকে নেমে এসে গুণগ্রাহী বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে আমার কানে কানে বললো, উদ্যোগ ভবনের কেরানীর ডিরেকশন কেমন লাগল রে?

আমি ওর কানে কানে বললাম, কেরানীর বউয়ের অভিনয় তোর কেমন লাগল তাই বল।

সত্যি আমি কল্পনা করি নি তোর বউ এত ভাল করবে। সী ইজ রিয়েলি ভেরী ট্যালেনটেড।

ঐ অডিটোরিয়ামে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অনেক পরিচিত বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হলো। কেউ বললো, তোর বউ তো ফাটিয়েছে, কেউ বললো যারা রেগুলার অভিনয় করে তাদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিয়েছে তোর বউ। রামজীবন এসে বললো, সত্যি দাদা, বৌদির অভিনয় দেখে অনেক দিন পরে চোখের জল ফেলতে বাধ্য হলাম। আস্তে আস্তে ভীড় ঠেলে ইন্দুদা এসে বললেন, অজয় রিহার্সাল দেবার সময়ই আমাকে বলেছিল, মামা, মিসেস সরকারের অভিনয় দেখে অবাক হয়ে যাবেন। তখন ভাই বিশ্বাস করি নি। ভেবেছিলাম নতুন হিরোইন সম্পর্কে সব সময়ই ওরা একটু বাড়িয়ে বলে কিন্তু আজ ওর এ্যাকটিং দেখে মন ভরে গেল।

বহুজনের অভিনন্দন কুড়িয়ে বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়া করে শুতে শুতে প্রায় একটা বাজলেও ঘুম এলো না। ঐ থিয়েটার নিয়েই কথা বলছিলাম দুজনে। গঙ্গা বললো, মনের মধ্যে অনুভব না করলে এসব বই অভিনয় করা যায় না।

তা তো বটেই।

তাছাড়া শরৎচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্রও এখানকার সবাই পড়ে না। এদের বই অভিনয় করতে গেলেও মুখস্থ করতে হয় কিন্তু এসব বই তো আমার মুখস্থ। যখন হাতের কাছে অন্য কোন নতুন বই পাই না তখনই তো আমি এদের বই পড়ি।

ঠিক বলেছ।

তবুও আমি ভীষণ নার্ভাস ছিলাম। কেবলই মনে হচ্ছিল হয়ত স্টেজে উঠে ভুলে যাব।....

আমি কিন্তু কল্পনাও করি নি তুমি এত ভাল করবে....

আমিই কি ভাবতে পেরেছিলাম ?

তোমার অভিনয়ে সবাইকেই কাঁদতে হয়েছে।

সত্যি ?

তোমাকে ছুঁয়ে বলছি।

গঙ্গা হাসতে হাসতে বললো, এমন করে জড়িয়ে থেকেও আবার ছুঁয়ে বলছ ?

আমি হাসলাম।

রাত যত গভীর হয় আমরা তত নিবিড় হই। কত কথা বলি কিন্তু তবুও কথা ফুরুতে চায় না। গঙ্গা বললো, যাই বল, কেষ্টবাবু আমার জন্য খুব খেটেছেন।

তাই নাকি ?

হাজার হোক আমি তো অভিনয় করি না। এই কদিনের মধ্যে আমার মত একজন অনভিজ্ঞ মেয়েকে তৈরী করা কি সহজ ব্যাপার ?

আমি তো থিয়েটার-টিয়েটার দেখি না কিন্তু কেষ্টর খুব সুনাম আছে।

ভদ্রলোক ডিরেকশন তো ভাল দেনই, তাছাড়া লোক হিসেবেও বেশ ভাল। আমাকে এত খাতির যত্ন করতেন যে আমারই লজ্জা করতো।

অন্যান্যরা ?

মোটামুটি সবাই বেশ ভাল। অজয় ছেলেটা দারুণ হাসাতে পারে।

দেখে তো মনে হয় না।

রিহার্সালের সময় ও একেবারে অন্য মানুষ।

আমি জানলা দিয়ে একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি। গঙ্গা বললো, যাই বল, থিয়েটার করার আনন্দই আলাদা।

পরের দিন সকালে দুজনেই দেরী করে উঠলাম। তবু ও স্কুলে গেল, আমি অফিস গেলাম। আগের দিন ফাঁকি দেবার জন্য সেকসন অফিসারের কাছে একটু খিচুনি খেলাম। ঘাড় গুঁজে কাজ করলাম লাঞ্চের আগে পর্যন্ত। লাঞ্চের সময় আড্ডা দিলাম। আবার ঘণ্টা খানেক কাজ করেই আবার চা খেতে ক্যান্টিনে যেতেই অনেক দিন পরে মালহোত্রার সঙ্গে দেখা। আমাদেরই সঙ্গে কাজ করতো। এখন মিঃ কুমারের ওখানে কাজ করে। কিছু না হলেও হাজার খানেক

টাকা মাইনে পায়। কোম্পানী থেকে সাউথ একস্‌টেনশনে বাড়ি দিয়েছে, স্কুটার দিয়েছে। কখনও কখনও প্লেনে চড়ে কলকাতা-বোম্বে যায়। সে যাই হোক মালহোত্রা এখনও আমাকে খুব খাতির করে, ভালবাসে। ও ভুলে যায় নি এই উদ্যোগ ভবনের সিঁড়িতেই পড়ে গিয়ে ওর যখন পা ভেঙে যায় তখন আমিই ওকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ওর পাশে বসেই জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার? এখানে একলা একলা বসে আছো?

ও হাসতে হাসতে বললো, ব্যাপার আছে বৈকি?

তা না হলে তুমি কি বসে থাকো? কিন্তু ব্যাপারটা কি?

মালহোত্রা আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, মহারানীবাগে তোমার বড় সাহেবের ছোট ভাইয়ের একটা বাড়ি আমরা ডবল ভাড়া দিয়ে ভাড়া নিচ্ছি....

তাই নাকি?

হ্যাঁ। অর্ধেক বড় সাহেবের পকেটে যাবে আর অর্ধেক ওর ভাই পাবে।

তা এখানে বসে আছো কেন?

এখানেই বসে থাকার কথা আছে। বড় সাহেবের ঘর খালি হলেই বেয়ারা ডেকে নিয়ে যাবে।

আমি হাসলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি চা খাবে?

না।

তাহলে, আমি চা আনতে যাচ্ছি।

যাও।

চা নিয়ে এসে আর মালহোত্রাকে পেলাম না।

পাঁচ

হাসপাতালের নার্সের মত কেরানীদের অস্তিত্ব থাকলেও তার স্বীকৃতি নেই। প্রয়োজনের দিনে, বিপদের দিনে গণ্য-মান্য-বরেণ্যরাও আমাদের কাছে আসেন, হাসিমুখে কথা বলেন কিন্তু প্রয়োজনের পালা শেষ হলে বিপদের দিন ফুরিয়ে গেলে হাসপাতাদের নার্সদের মত আমরাও উপেক্ষিত ও নিন্দিত। বোধহয় ঘৃণিতও।

তবু দিন কেটে যায়। ভোর সাড়ে পাঁচটায় উঠে দুধের জন্য লাইন দিই। কোনদিন আধ ঘণ্টা কোনদিন দু ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দুধ পাই। বাড়ি আসি। চা খাই, খবরের কাগজ পড়ি। গঙ্গার সঙ্গে একটু গল্প-গুজব করি। দাড়ি কামাই, স্নান করি। অফিসে যাবার জন্য জামা-কাপড় পরি। খেতে বসি। কোনদিন একলা, কোনদিন দুজনেই একসঙ্গে বসি। তারপরই মা কালীর ফটোকে প্রণাম করে বাস স্টপের দিকে পা বাড়াই।

শুনছ!

গঙ্গার ডাক শুনে একটু দাঁড়াই। জিজ্ঞাসা করি, কিছু বলছ?

তোমাদের কো অপরেটিভ থেকে দুটো স্যাণ্ডেল সাবান আর এক শিশি ক্যালিফোর্ণিয়ান পপি এনো তো।

আমি চট করে ব্যাগ খুলে একবার দেখে নিয়েই বলি, ঠিক আছে।

লাইন দিয়ে বাসে উঠেই নন্দলালের সঙ্গে দেখা। এককালে আমার দাদার বন্ধু থাকলেও পরবর্তীকালে আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়। বয়সে আমার চাইতে বড় কিন্তু এখনও বিয়ে করে নি। কোন না কোন সরকারী কোয়ার্টারে একখানি ঘর ভাড়া নিয়েই থাকে। কোথাও ছ' মাস কোথাও বা দু-এক বছর। বাবা নেই। দুটি বোনের বিয়ে দিয়েছে। এখন মা ছোটকাকার সঙ্গে উত্তর-পাড়ায় আছেন। নন্দলাল

মাসে মাসে টাকা পাঠায়। দায়িত্ব কর্তব্য পালনে ওর কোন ত্রুটি নেই, পাড়ার ক্লাব আর পরিচিতদের জন্য বেগার খাটতে।

নন্দলালকে আমার বড় ভাল লাগে। কৃষি ভবনে সাধারণ লোয়ার ডি`ভিসন কেরানী ছিল। মাত্র বছর খানেক আগে আপার ডিভিশন কেরানী হয়েছে। অর্থ না থাকলেও পরের উপকার করার সামর্থ্য ওর অসীম। সরকারী অফি`সের নোংরামীর মধ্যে কাজ করে আমাদের সামান্যতম পুঁজিটুকুও হারিয়ে ফেলছি। দারিদ্র্য ও দীনতার চাইতে মানসিক হীনতায় আমরা বেশী ডুবে থাকি। আমাদের যাই থাক ঔদার্য নেই। পরের দুঃখে দুঃখী হলেও অন্যের সুখে সুখী হতে আমরা পারি না। নন্দলাল পারে।

আমাকে দেখেই নন্দলাল ডাকল, এসো, সোমনাথ এসো। পুজোর পর এই তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা।

তুমি কি এখন আমাদের পাড়াতেই আছো?

না। একটু রথীন ঘোষের বাড়ি এসেছিলাম।

রথীনবাবু কি অসুস্থ?

অনেক দিন অসুস্থ থাকার পর এখন একটু ভাল।

কি হয়েছে?

বেশী চিন্তা-ভাবনা করলে যা হয়....

হার্ট এ্যাটাক?

নন্দলাল মাথা নেড়ে বললো, আবার কি!

আমার বাড়ি থেকে রথীনবাবুর বাড়ি বড় জোর দশ মিনিটের পথ কিন্তু তবু আমি ওর খবর নিইনি। আর নন্দলাল? কথা শুনেই বুঝলাম সে নিয়মিত খোঁজ-খবর নেয়। ভাবতে গিয়েও লজ্জা পেলাম। প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্য বললাম, বোনেদের তো বিয়ে দিয়েছ, এবার তুমি একটা বিয়ে কর। আর কত কাল এভাবে....

আমার পুরো কথাটা না শুনেই ও হাসতে হাসতে বললো, বিয়ে করলে কি রথীনদার বিপদের দিনে এসে দাঁড়াতে পারতাম? তাছাড়া বিয়ে করলেই কি সুখী হবো?

আমি আর কিছু বলতে পারি না। শুধু বললাম, একদিন বাড়িতে এসো।

আসতে তো ইচ্ছা করে কিন্তু সত্যি সময় পাই না। কোন না কোন কাজে রোজ ঠিক আটকে পড়ি।

বাস থেকে নামার সময়ও দু একজন পরিচিত বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হয়।

কিগো সরকার, তোমার বউ বলে খুব ভাল অভিনয় করছে?

আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিই, তোমার বউও তো তোমার সঙ্গে বেডরুমে অভিনয় করে।

অফিসে গিয়েই টেবিল পরিষ্কার করে কাগজ-কলম-পেন্সিল সাজিয়ে কাচের গেলাসটা নিয়ে জল খেতে যাই। জল খেয়ে এক গেলাস জল ভরে আনি। কাজ শুরু করি। কাজ করতে করতেই একবার মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি মিস রায় মুখের সামনে ফেমিনা নিয়ে ইসারা করে খান্নাকে কিছু বলছে। ওদের দুজনের মধ্যে যে একটু ভাব জমেছে সে খবর এখন অনেকেই জেনেছেন। প্রত্যেকদিন ছুটির পর খান্না স্কুটার নিয়ে নির্মাণ ভবনের ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকে আর একটু পরে মিস রায় হাজির হলেই দুজনে এক সঙ্গে চলে যায়। দুজনকে এক সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরাঘুরি করতেও অনেকে দেখেছেন। একবার ছুটির দিন সেকসন অফিসার সাহেব ছেলেমেয়েদের নিয়ে বুদ্ধ জয়ন্তী পার্কে বেড়াতে গিয়েও ওদের দুজনকে দেখেছিলেন। অথচ খান্না যে বিবাহিত এ খবর মিস রায় নিশ্চয়ই জানেন। তবুও উনি কেন যে ওর সঙ্গে মেলামেশা করেন তা আমরা কেউ বুঝতে পারি না।

দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলাম। ভাবলাম ওরা যা ইচ্ছে করুক। কেশব দত্তের ভাষায় ওদের পাঁঠা ওরা ল্যাজে কাটুক। আমার কি আসে যায়? আমি তো গঙ্গা ছাড়া আর কোনো মেয়েকে ভালবাসি না। কল্পনাও করতে পারি না। গঙ্গা মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি যে এখন আমাকে এত ভালবাস কিন্তু আমি যখন বুড়ি হবো, তখনও কি এইরকম ভালবাসতে পারবে?

দেখ গঙ্গা, খুব বেশী লেখাপড়া আমি না করলেও অন্তত এইটুকু শিখেছি যে স্ত্রীকে অবজ্ঞা বা বিশ্বাসঘাতকতা করার মধ্যে কোন কৃতিত্ব বা গৌরব নেই।

গঙ্গা বললো, এর আগে কখনও কখনও আমার মনে হতো তোমার চাইতে ভাল—মানে একটু লেখাপড়া জানা ও একটু ভাল চাকুরে ছেলেকে হয়ত বিয়ে করলে আরো একটু আরামে থাকতাম কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়েছে তোমার কাছে যে শান্তি পাচ্ছি তা অন্য কারুর কাছে সম্ভব নয়।

আমি হাসি।

তুমি হাসছ? আমি সত্যি বলছি আমি মনে মনে এসব ভাবি। মনে মনেই বিচার করি।....

আমি কিন্তু এসব কিচ্ছু ভাবি না।

আমিও আজকাল আর ভাবি না। আগে মাঝে মাঝে ভাবতাম।

এখন ভাব না কেন?

তুমি কি ভাব তোমাকে ছাড়া আর কাউকে নিয়ে আমার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব?

অসম্ভব কি?

চুপ করো তো!

চুপ করব কেন?

এইসব নোংরা কথা বললে আমি তোমার কাছ থেকে এখুনি চলে যাব।

এসব কথা আমরা আর আলোচনা করি না। দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ি।

দশটায় অফিসে ঢুকি। দেখতে দেখতেই লাঞ্চের সময় হয়ে যায়। ইন্দুদার ঘরে আমরা সবাই জমা হই। যে যার টিফিনের কৌটো খুলে বসি। কেশব দত্ত বলে, কিরে কেষ্ট, কাল বুঝি বউ পাশে শুতে দেয় নি?

নারে।

কেন কি হয়েছিল ?

তোর বউয়ের একটা প্রেমপত্র আমার পকেটে পেয়ে ভীষণ রেগে গিয়েছিল।

আমার বউ এমনি বাতে কষ্ট পাচ্ছে। তাকে নিয়ে আবার টানাটানি করছিস কেন ? তোর বউ যে তোর উপর রেগে গেছে তা তোর টিফিন কৌটো দেখেই বুঝতে পারছি।

কেষ্ট ঘোষ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললো, পার্লামেন্ট সেল-এ কাজ করে করে মন্ত্রীদের মতই ফালতু বকতে শিখেছিস। কোন খবর তো রাখিস না। ইন্দুদার গিন্নী আজ আলুর দম পাঠিয়েছে, সে খবর রাখিস ?

যে যাই বলুক দুপুর বেলায় বন্ধুদের সঙ্গে এই লাঞ্চ আওয়ারের আড্ডা আর রাত্রে বউয়ের পাশে শুয়েই কেরানীরা বেঁচে আছে। এ দুটি না থাকলে কেরানীদের জীবন সত্যি মরুভূমির মতো প্রাণহীন রসহীন হতো। সারা দেশে কবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে জানি না, তবে নেতাদের শ্লোগান শোনার আগেই আমরা কেরানীরা লাঞ্চের আড্ডায় সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছি। কেশব দত্তের চেহারা দশাননের মত হলেও ওর স্বাস্থ্য সম্পর্কে ওর গিন্নির বড় উৎকণ্ঠা। তাই ওর টিফিন বাকসে আর কিছু থাকুক আর নাই থাকুক ঘরের তৈরী চার-ছটা সন্দেশ থাকবেই। কেশব দত্তের জন্য অতগুলো সন্দেশ দেবার দরকার নেই জেনেও ওর গিন্নী আমাদের কথা ভেবে দিয়ে দেন। আমাদের এই লাঞ্চ ক্লাবের কথা ভেবেই গঙ্গা মাঝে মাঝেই ডজন খানেক এগ-স্যাণ্ডউইচ ভরে দেয় আমার টিফিন বাকসে। কেষ্ট ঘোষের বউ লুচি একসপার্ট। লুকিয়ে জমিয়ে রাখা ডালডা দিয়ে ভাজা লুচি মাসের শেষের দিকেই উদ্যোগ ভবন পৌঁছয়। যে যাই আনি না কেন, একাউন্টসের ইন্দুদা সমানভাবে ভাগ করে দিতে ত্রুটি করেন না।

খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে আড্ডা। গল্প-গুজব, পর নিন্দা পরচর্চা। এমন কী খিস্তিও। যেসব কথা কখনও কোথাও আমরা বলতে পারি না, সেসব কথা অশ্লীল মন্তব্য দ্বিধাহীন চিত্তে ও মনে

লাঞ্চক্লাবে বলি শুনি। সরকারী আজ্ঞা আধ ঘণ্টায় লাঞ্চ সারতে হবে কিন্তু সরকারী অফিসের কোন বেয়ারাও আধ ঘণ্টা পরে অফিসে ফিরে যায় না। শিবনাথদা একটু তাড়াহুড়ো করে উঠতে গেলেই ইন্দুদার কাছে বকুনি খায়, অফিসাররা যেখানে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত বউকে জড়িয়ে শুয়ে থাকার পর অফিসে আসে সেখানে তোর এত তাড়াতাড়ি ওঠার গরজ কেন বলতো?

আমি জিজ্ঞাসা করি, ইন্দুদা, অফিসাররা বুঝি দিনের বেলায় বউকে জড়িয়ে…

ঐটুকু শুনেই ইন্দুদা জবাব দেন, সন্ধ্যার পর পরের পয়সায় মাল টানার পর কী আর রাত্রে বউকে আনন্দ দেবার ক্ষমতা কোন অফিসারের থাকে? ও শালারা দিনের বেলাতেই রাতের কাজকর্ম সেরে রাখে বলেই তো লাঞ্চ থেকে আসতে এত দেরী করে।

কেশব দত্ত বললো, যারা মাল খায় না। তারাও

ইন্দুদা টেবিলের উপর জোরে একটু ঘুষি মেরে বললেন, কোন্ শালা মাল খায় না?

কেশব দত্ত তর্ক করে, তাই বলে সবাই।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই।

তুই বড় এঁড়ে তর্ক করিস।

এবার ইন্দুদাও রেগে যান, সবাই মানে এ্যাটলিস্ট পনের আনা অফিসার মাল খায়। আর খাবে না কেন? পরের পয়সায় মাল পেলে তোর-আমার মত স্ত্রৈণ কেরানীরাও খেতো। ইন্দুদা নিশ্বাস নিয়ে আবার বললেন, যেদিন লাইসেন্স পারমিটের জন্য ব্যবসাদার-দের উদ্যোগ ভবনে আসতে হবে না, সেদিন দেখবি বারো আনা মদের দোকানের গণেশ উল্টেছে। যখন উদ্যোগ ভবন হয় নি তখন দিল্লীতে ক'টা মদের দোকান ছিল রে?

ইন্দুদা রাগের মাথায় কথাগুলো বললেও আমরা সবাই ওর বক্তব্যকে সমর্থন জানালাম।

ইন্দুদা হাসতে হাসতে ঘোষণা করলেন, লাঞ্চ আওয়ার ইজ ওভার!

আধঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাজ করতে না করতেই দু'তিন জনে মিলে চা খেতে ক্যান্টিনে যাই। ফিরে আসতে আসতেই প্রায় চারটে বাজে। তারপর ফাইল হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলেও কাজে মন লাগে না। সাড়ে চারটে বাজলেই ফাইলপত্র এক পাশে সরিয়ে কাগজ-কলম পেন্সিল কাচের গেলাস ড্রয়ারে রেখে চাবি দিই। বিদায় নেবার আগে সেকসন অফিসারের টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করি, আপনার ছেলের ইণ্টারভিউয়ের চিঠি এসে গেছে?

ছেলের খোঁজখবর নেওয়ায় সেকসন অফিসার খুব খুশী। বললেন, বলেছিল তো বিশ-বাইশের মধ্যেই আসবে কিন্তু···

তাহলে বোধহয় ডাকের গণ্ডগোল।

হয়ত এখনও পাঠায় নি। রেলের অফিসে কি কেউ কাজ করে? সব ঘুষখোর অকর্মণ্য লোকগুলো রেলে ঢুকেছে।

সেকসন অফিসারের কথা শুনে হাসি পেলেও চেপে যাই। বলি, আমি কাল একবার বরোদা হাউসে গিয়ে খোঁজ করব?

তা নিলে তো ভালই হয়।

ঠিক আছে স্যার। আমি কালই যাব।

ক্রিকেট-হকি-টেনিস খেলার রীলে চললে খান্না ছোট্ট ট্রানজিস্টার নিয়ে অফিসে আসে। টেবিলের উপর রেখে চালিয়ে দেয়। আমরা সবাই শুনি। চিৎকার করি, সাবাস চন্দ্রশেখর!

সেকসন অফিসার জিজ্ঞাসা করেন, কে গেল?

স্নীপার লয়েড। অন্য কেউ বলার আগেই মিস রায় জবাব দেন।

টেনিস খেলা আমরা দেখি নি, বুঝি না। তবুও ডেভিস কাপের খেলার রীলে আমরা শুনবই। অফিসে বসেই শুনব। সবাই শোনেন। কেউ আপত্তি করেন না।

এমনি করেই দিনটা ফুরিয়ে আসে। মনে মনে বলি ভারত সরকার জিন্দাবাদ।

বাড়িতে পৌঁছেই দেহটা সোফায় এলিয়ে দিই। গঙ্গা মনে করে

সারাদিন কত পরিশ্রম করেছি। ও মনে মনে সমবেদনা জানায়, তাড়াতাড়ি চা আনে। আজকাল অবশ্য রোজ বাড়ি এসেই গঙ্গার দেখা পাই না। পল্লীসমাজে রমার ভূমিকায় ওর অভিনয় ছড়িয়ে পড়ার পর বহু ক্লাব থেকে বহু অনুরোধ আসে। সবাইকে না বলতে পারা যায় না। সবার অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করতে আমারও খুব খারাপ লাগে। দুটো-একটা বইতে নামতেই হয়। গঙ্গারও ভাল লাগে। আমিও আপত্তি করি না। কেন আপত্তি করব? ছেলেমেয়ে যখন দিতে পারলাম না তখন এটুকু আনন্দের সুযোগ থেকে ওকে বঞ্চিতা রাখি কেন?

রিহার্সাল থাকলে ওর ফিরতে ফিরতে সাড়ে ন'টা-দশটা হয়ে যায়। রান্না-বান্না করে টেবিলের উপর আমার জলখাবার ঢেকে রেখেই ও যায়। আমি হাত-মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে বাজার করে এসে বাড়িতেই থাকি। তারপর গঙ্গা ফিরলে একসঙ্গে খেয়ে শুয়ে পড়ি।

গঙ্গা বাড়িতে থাকলে চা খেতে খেতেই দুজনে দুজনকে সারা দিনের গল্প শোনাই। স্কুলের গল্প, অফিসের গল্প, পাড়ার গল্প, নেপোদার গল্প, বঙ্কিমদার মেয়ের কাহিনী। কোনদিন আধ-ঘণ্টা-এক ঘণ্টা। কোনদিন তারও বেশী। গঙ্গা জিজ্ঞাসা করে, আমি উঠব না?

না।

রান্না করব না?

না।

রাত্রে খাবে কি?

কেরানীগিরি করলেও বউয়ের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে গল্প করতে করতে কবি হয়ে উঠি। বলি, তোমার সান্নিধ্যেই আমার সব ক্ষুধার নিবৃত্তি।

গঙ্গা হেসে উঠে। বলে, কি ব্যাপার বলতো? তুমিও কি অভিনয় করা শুরু করলে? নাকি মিস রায়কে একটু কাছে পেয়েছিলে বলে আজ মনটা খুশীতে ভরে আছে?

তুমি জান না অবিবাহিতা মেয়েদের ব্যাপারে আমার এ্যালার্জি আছে?

বিবাহিতা মেয়েদের ব্যাপারে সব ভদ্দর লোকেরই এ্যালার্জি থাকে।

তাই নাকি?

তাই তো মনে হয়।

রান্না করার পর, খাওয়া-দাওয়ার আগে ও পরেও কত গল্প করি দুজনে। ওকে জড়িয়ে শোবার পরও কখনো সরবে কখনো নীরবে মনের কত কথা বলি। হঠাৎ প্রশ্ন করি, আচ্ছা গঙ্গা, যেদিন তুমি আর আমার কাছে থাকবে না, সেদিন কিভাবে আমার দিন কাটবে বলতে পার?

গঙ্গা হাসে। বলে, আমার কি ক্যান্সার হয়েছে নাকি সত্তর-আশী বছরের বুড়ী হয়েছি যে এখনই আমার চলে যাবার কথা ভাবছ?

আমি জবাব দিই না। চুপ করে থাকি। ও আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। আমি ঘুমিয়ে পড়ি। সরকারী কেরানীর জীবনের একটি দিনের মেয়াদ শেষ হয়।

সেদিন বাড়িতে এসে তালা বন্ধ দেখেই বুঝলাম গঙ্গা রিহার্সালের স্টেজে, কিন্তু বাড়ির ভিতরে ঢুকে ডাইনিং টেবিলে আমার জলখাবার না দেখেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। শোবার ঘরে যেতেই বিছানার উপর একটা খামে ভরা চিঠি পেলাম।

সোমনাথ—আজ তোমার জলখাবার রেখে যেতে পারলাম না বলে ক্ষমা করো। রাত্রেও হোটেলে খেয়ে নিও। আমি অজয়ের সঙ্গে চললাম। ফিরব না, ফিরতে পারব না, উপায় নেই।

গঙ্গা